Vol. 30 | No. 1 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী

Volume	30
Issue	1
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এ. কে. এম. খায়রুল আলম
Published online	October 30, 1986
DOI	10.62328/sp.v30i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i1.1
Pages	1-68
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী

এ. কে. এম. খায়রুল আলম

এক

ক. 'সধবার একাদশী'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি পাওয়া যায়নি বলে নাটকটির রচনাকাল ও প্রকাশকাল বিষয়ে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ-কারণে দীনবন্ধুর নাট্যকর্মের পর্যায়ক্রমিক উৎ-কর্ষের ধারা বিবেচনার তথা সামগ্রিকভাবে দীনবন্ধু-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দ্বন্দ্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ দুরূহ হয়েছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের অধিকাংশ আলোচক এবং দীনবন্ধু-গবেষকদের ধারণা 'সধবার একাদশী' নাটকটি 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসনের পরবর্তী রচনা। 'সধবার একাদশী'র প্রকাশকাল এবং রচনাকালের মধ্যে যে একটি ঐতিহাসিক ব্যবধান বিদ্যমান---তা তাঁদের অধিকাংশের ভাবনাবিন্দুকে স্পর্শ করেনি। অবশ্য এই নিস্পৃহতার প্রধান উৎস ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশিত 'সধবার একাদশী'র একটি সমালোচনা।[১] ঐ একই পত্রিকায় এর চারমাস পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে জুলাই 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।[২] এই 'নির্দ্দোষ-আমোদপ্রদ' প্রহসন 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র সমা-লোচনা প্রকাশকালে সম্পাদক লেখেন, "তিনমাস পূর্বেই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল।" এই তিনমাস যোগ করে সমালোচক-মহল 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র প্রকাশকাল এবং রচনাকাল যুগপৎ ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসের কোন এক সময় বলে ধারণা করেন। এ-সাদৃশ্যে 'সধবার একাদশী'র প্রথম সংস্করণের অবর্তমানে 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশিত সমালোচনার তারিখটি ধরে 'সধবার একাদশী'কে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। সমালোচনা-প্রকাশের তারিখ ধরে গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ কিংবা গ্রন্থ-রচনার তারিখ নির্ধারণ সর্বদা সত্য হবে এমন ধারণা যথার্থ নয়। আমাদের বিশ্বাস,

'সধবার একাদশী' ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের কোন এক মাসে[৩] প্রকাশিত হলেও, এর রচনাকাল 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র রচনাকালের পূর্বে। 'সধবার একাদশী'র রচনাকাল এবং প্রকাশকালের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তাকে 'বেঙ্গলী' পত্রে প্রকাশিত সমালোচনার পরোক্ষ-প্রমাণে উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। সত্যস্পর্শী হতে অনুমান অপেক্ষা সমসাময়িক ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যকে প্রামাণ্য বিবেচনা করা উচিত। এ-প্রশ্নে আমরা দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যকেই যথার্থ বলে বিবেচনা করি, "সধবার একাদশী' 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরে প্রকাশিত হয়, কিন্তু উহা তৎপূর্বে লিখিত হইয়াছিল।"[৪] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্য যে যথার্থ তা 'সধবার একাদশী'র আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্য এবং নাটকীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমকালীন দেশকালের ঘটনাপুঞ্জের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-সূত্রেও উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু বিস্ময়কর এই যে, পরবর্তী দীনবন্ধু-গবেষকদের অধিকাংশই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধান্বিত চিত্ত-উদ্ভূত দীনবন্ধু-মূল্যায়ন নির্বিচারে গ্রহণ করলেও, 'সধবার একাদশী'র রচনাকাল বিষয়ে তাঁর পরিবেশিত তথ্যটি উপেক্ষা করেছেন। অথচ 'সধবার একাদশী'র স্বরূপ বিশ্লেষণে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' এবং এই প্রহসন ধারার পরিণত-সৃষ্টিকর্ম 'সধবার একাদশী'--সমালোচকদের এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত থেকে উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারকে "উচ্চাঙ্গের কমেডি" রচয়িতা বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।[৫] প্রথাবদ্ধ অনুভব, সীমাবদ্ধ নাট্যবোধ এবং তথ্যের বিভ্রান্তি থেকে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে রামগতি ন্যায়রত্ন 'সধবার একাদশী'কে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরবর্তী রচনা এবং একে 'প্রহসন' বলে উল্লেখ করা, উপর্যুক্ত ভ্রান্তির জন্ম হয়েছে।[৬] নাটকটিকে 'নবীন তপস্বিনী'র পরে এবং 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পূর্বের রচনা ধরলে 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করার আশঙ্কা হতো সীমিত এবং দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য-প্রতিভার ক্রমবিকাশ হতো সুস্পষ্ট। এতদ্‌সত্ত্বেও, রামগতি ন্যায়রত্নের অভিমত সুদীর্ঘকাল নাট্য-সমালোচকরা অতিক্রম করতে পারেননি। বারংবার 'সধবার একাদশী'কে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরবর্তী রচনা ধরে তাকে প্রহসন এবং কখনো নাটকটির অন্তর্সত্তার অনন্য নাট্যধর্মে দ্বিধান্বিত হয়ে কমেডি বলে সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।

এই দ্বিধান্বিত মূল্যায়নের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত "দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী"র অন্তর্ভুক্ত 'বিয়ে পাগ্‌লা বূড়ো'র ভূমিকাংশে। 'সধবার একাদশী'র প্রকাশকাল সম্পর্কে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত অস্বীকার করেছেন এই যুক্তিতে যে, 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র অপেক্ষা 'সধবার একাদশী' "আরও পরিণত রচনা"।[৭] পরিণত রচনা মাত্রেই যে, পরবর্তী সময়ের রচনা হবে, এমন স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সাহিত্যালোচনায় অভ্রান্ত নয়। পক্ষান্তরে এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নাটকটির মূল্যায়নে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের দীনবন্ধু-সম্পাদনায় সন্নিবেশিত নাটকসমূহের ক্রমধারাকে প্রামাণ্য গণ্য করে এ-কালের অনেক গবেষকও 'সধবার একাদশী'কে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরে রচিত দীনবন্ধুর 'দ্বিতীয় প্রহসন' বলে বিভ্রান্ত হয়েছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের তথ্য গ্রহণ করতে হলে পরবর্তীকালে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) নাটক ও প্রহসনকে তুলনামূলকভাবে আরো পরিণত সৃষ্টিকর্ম বলে স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে উপর্যুক্ত নাট্যত্রয় ক্রমশঃ অবসিত, প্রতিবেশ-শৃঙ্খলিত এবং রোগাক্রান্ত দীনবন্ধু-প্রতিভার বিলম্বিত আত্ম-অনুকৃতি মাত্র। দীনবন্ধুর নাট্য-প্রতিভার সর্বোচ্চস্তর এবং তার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে 'সধবার একাদশী' নাটকে। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সার্থক প্রহসন রচনার কৃতিত্ব অর্জন করলেও, সর্বাংশে নিখুঁত নাটক দীনবন্ধু আর রচনা করতে পারেননি। রচনাকাল এবং প্রকাশকালের নির্ভরযোগ্য তথ্য ব্যতীত 'সধবার একাদশী'কে দীনবন্ধুর প্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরবর্তী তাঁর 'দ্বিতীয় প্রহসন' হিসেবে নির্দেশ করা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের বিবেচনায় 'সধবার একাদশী'র রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে সৃষ্ট ব্যবধান এবং নাটকটি বিলম্বে প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখযোগ্য :

১. 'সধবার একাদশী'র প্রকাশকাল যে বিলম্বিত হয়েছিল, এ-তথ্য যেমন বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, তেমনি এ-বিলম্বের দায়িত্বও তিনি স্বীকার করেছেন : "সধবার একাদশী'র যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষও আছে।··· বিশুদ্ধরুচির অনুমোদিত

নহে এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছুদিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল।"[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধ কতদিন রক্ষিত হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ না করলেও, বিলম্ব যে হয়েছিল তা অস্বীকার করার কারণ নেই। সুতরাং প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের অবর্তমানে এবং প্রকাশকাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সমালোচনা দেখে অনুমান নির্ভর রচনাকাল ও প্রকাশকাল নির্ধারণ যুক্তিনিষ্ঠ নয়। ২. 'নবীন তপস্বিনী' নাটক প্রকাশের দীর্ঘ তিন বৎসর পর প্রকাশিত হয় 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসন। দীর্ঘ কালপরিসরে দীনবন্ধু মিত্র একটি ক্ষুদ্র প্রহসন রচনা করেছেন আর মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে রচনা করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক এমন অনুমান কষ্টকর। 'বেঙ্গলী' পত্রে ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুলাই 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' এবং ২৪শে নভেম্বর 'সধবার একাদশী'র সমালোচনা প্রকাশের ব্যবধানটি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সাক্ষ্য[৯] অনুসারে তিনমাস বর্ধিত করে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র প্রকাশকাল বৎসরের গোড়ায় সরিয়ে নিলেও কাল-পরিসর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। তাছাড়া যে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসনের সমালোচনা প্রকাশের তারিখ নিয়ে এই কাল নির্ধারণ করা হয়, তার প্রকাশ-কালও অনুমান-নির্ভর। কারণ 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র পাওয়া যায়নি।[১০] সুতরাং সমালোচনা প্রকাশকালের পরোক্ষ প্রমাণে তার রচনাকাল নির্ধারণও অনুমান-ভিত্তিক। 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র সমালোচনা প্রকাশে যদি তিনমাস বিলম্ব ঘটে, তাহলে 'সধবার একাদশী'র সমালোচনা প্রকাশেও যে বিলম্ব ঘটেনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। যার নিজের জন্ম-লগ্ন সুনিশ্চিত নয়, তার মানদণ্ডে অন্য একটি সৃষ্টিকর্মের অনিশ্চিত জন্মক্ষণ নির্ধারণ করার প্রবণতায় প্রকৃতপক্ষে 'সধবার একাদশী'র রচনাকাল ও প্রকাশকাল অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। আমাদের অনুমান—'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পূর্বেই 'সধবার একাদশী' নাটকের রচনা শেষ হলেও, বিলম্বিত প্রকাশের জন্য এর সমালোচনা প্রকাশেও বিলম্ব ঘটে। ৩. 'সধবার একাদশী' রচনার সময় দীনবন্ধুর সচেতন প্রতিপাদ্য ছিল শতাব্দীর নীতিহীন রতিবিলাস, বিকৃত মদ্যাসক্তি, স্থূল গণিকা-আভিজাত্য, নব্যশিক্ষিতের সভ্যতাগর্ব এবং সনাতনপন্থীদের ধর্মধ্বজার পটভূমিকায়

উনিশ শতকের পরাজিত মধ্যবিত্তের পরাভবের স্বরূপ উন্মোচন। উপর্যুক্ত নৈতিক অধঃপতন, মানসিক পচন ও সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য আর্থ-সামাজিক উৎস সন্ধান না করে সুরাপানের তীব্রতা ও মাত্রাতিরিক্ততাকেই এর কারণ ভেবে সমকালের বুদ্ধিজীবিদের একাংশ সুরাপানের বিষফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সুরাপান-বিরোধী একটি সামাজিক আন্দোলন সমস্ত সুস্থ মানুষকে আত্ম-বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ করে।[১১] প্যারীচরণ সরকারের নেতৃত্বে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয় বিখ্যাত 'সুরাপান নিবারণী সভা'। এই সভার সামাজিক ভাবাদর্শ দীনবন্ধুকে 'সধবার একাদশী' নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ ও সংবেদনশীল করে তোলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে 'নবীন তপস্বিনী' নাটক প্রকাশ এবং 'সুরাপান নিবারণী সভা'র আত্মপ্রকাশ দীনবন্ধু মিত্রকে তাঁর তৃতীয় নাটক রচনার জন্য সুযোগ ও সামাজিক পরিস্থিতি দান করে।[১২] ব্রাহ্মধর্মের সদস্যদের মধ্যে মূলতঃ সুরাপান বিরোধী মনোভাব প্রসার লাভ করে এবং তাঁরাই ছিলেন 'সুরাপান নিবারণী সভা'র অন্তর্শক্তি। সমন্বয়ধর্মী উদারতাবাদে বিশ্বাসী, বাস্তবতাবোধ ও মানবকল্যাণ ধর্মে নিবেদিত এবং ইতিহাস-পরিস্রুত জীবনদৃষ্টির সামঞ্জস্যচিন্তা ও সামগ্রিকতায় অনুরক্ত দীনবন্ধু মিত্রের পক্ষে তাই বিষয়টিকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশের পর পরই তিনি যে 'সধবার একাদশী' রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, এমন অনুমান যুক্তিসিদ্ধ। উনিশ শতকের বাঙালীর ট্রাজেডি এবং তার শিল্পরূপের পরম-সূক্ষ্মতার পরম্পরিত উপস্থাপনের এই অনন্য সাধনা নিঃসন্দেহে ছিল সময় সাপেক্ষ এবং দুরূহ। এতদ্‌সত্ত্বেও দীনবন্ধু সার্থকতা অর্জন করেন। নাটকটির রচনা শেষ হলেও, এর প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের উপ-দেশের কারণে হয় বিলম্বিত। ৪. দীনবন্ধু মিত্রের জীবৎকালেই ১৯২৭ সংবতে বা ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণটিকে আদর্শ ধরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 'সধবার একাদশী' সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রকাশকাল-বিষয়ক একই ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র।[১৩] পূর্বেই বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, কেন অনুমান অপেক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং এ-সত্য আমরা নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করতে পারি যে, 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধু মিত্রের

তৃতীয় নাটক এবং এর পরবর্তীকালে রচিত হয় তাঁর প্রথম প্রহসন 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'।

দীনবন্ধু মিত্রকে যাঁরা প্রধানতঃ প্রহসন-নির্মাতা হিসেবে সনাক্ত করতে আগ্রহী, তাঁর নাট্যপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞার ব্যতিক্রমী ধর্ম সম্পর্কে দ্বিধান্বিত এবং তাঁকে সময় ও সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে বিচারে অনভ্যস্ত ও অনাগ্রহী—তাঁরাই 'সধবার একাদশী'কে পরিণত-প্রহসন প্রমাণের জন্য এর রচনাকাল 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র পরবর্তী নির্ধারণ করেছেন। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী'র নাট্যাভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথাবদ্ধ নাট্যবিন্যাসরীতি ও পরিচর্যা-কৌশল অতিক্রম করে আলোচ্য নাটকে উন্মোচন করেন নতুন সম্ভাবনা ---সমকালীন বৃত্তনির্মাণ, চরিত্রায়ন ও রস-নিষ্পত্তির ধারায় সংযোজন করেন নতুন মাত্রা। 'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু প্রকরণ অপেক্ষা বিষয়-সতর্ক, 'নবীন তপস্বিনী'তে বিষয় ও প্রকরণের সমন্বয়-প্রয়াসে নিরীক্ষাশীল, কিন্তু বিষয়-ভাবনার গভীরতা ও বিন্যাসরীতির মৌলিকত্বে 'সধবার একাদশী' অভিনব। এই অভিনবত্বের জন্যেই বারংবার নাটকটি সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—'সধবার একাদশী' নাটক না প্রহসন।

খ. উনিশ শতকের সর্বাপেক্ষা নিন্দিত, সন্দিগ্ধ এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসিত নাট্যকর্ম দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। এর বিষয়-বিবেচনায় যেমন বিপ্রতীপ সিদ্ধান্ত লক্ষযোগ্য, তেমনি শিল্পমূল্য বিচারের চরম মীমাংসায় অধিকাংশ সমালোচক সংশয়াচ্ছন্ন। তাঁদের অনেকে যেমন 'সধবার একাদশী'কে নাটক অভিধায় গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত, তেমনি অনেকে এর প্রহসন-গুণে মোহান্ধ, আবার কারো কারো ধারণা এটি একটি কমেডি। কেউ একে প্রহসন-প্রমাণে অন্ধ যুগপ্রভাবিত, শ্লীল-অশ্লীলতা ব্যাখ্যায় অমিতচারী; পক্ষান্তরে অনেকে একে নাটক-রূপে বিশ্লেষণে শ্রমবিমুখ, প্রথাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এঁরা প্রহসনকে নাটকের এবং নাটককে প্রহসনের রূপরীতির মানদণ্ডে বিবেচনায় আগ্রহী হয়ে সর্বদা বিপরীত সিদ্ধান্তে খণ্ডিত হয়ে পড়েছেন। এর কারণ, প্রহসনের তরল ছাঁচে, কিংবা কমেডির প্রচলিত সংজ্ঞায় যেমন 'সধবার একাদশী'র চরিত্র-স্বরূপ ও বিষয়-নির্যাস নিরূপণ করা যায় না, তেমনি শেক্সপীয়রীয় প্রথাবদ্ধ সংজ্ঞানুসারে একে সহসা নাটক

বলে স্বীকার করাও দুরূহ। সে-জন্যে কোন মীমাংসিত-সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই অনেক সমালোচক যেমন 'সধবার একাদশী'কে তার বহিরাঙ্গিক কৌতুক ও ব্যঙ্গধর্মে প্রলুব্ধ হয়ে প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তেমনি অনেকে এর আভ্যন্তর সংগঠন ও চরিত্র-শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে একে কমেডি শ্রেণীর নাট্যকর্ম বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে 'সধবার একাদশী' নাটক, কমেডি, না প্রহসন এ-জটিলতা আজো বিদ্যমান।[১৪]

'সধবার একাদশী'র চারিত্রধর্ম-বিষয়ক প্রথম আলোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের (১৮৩৬-১৮৮০)[১৫] আলোচনায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপর্যুক্ত স্ববিরোধিতার ছায়া-সম্পাত ঘটেছে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে 'সধবার একাদশী'কে কখনো 'নাটক', কখনো 'গ্রন্থটি' শব্দের উল্লেখে এর নাট্যধর্মের পরিচয়কে বিশ্লেষিত করতে চেয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি দ্বিধামুক্ত নন। তাঁর দ্বিধান্বিত মানসের পরিচয় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে অত্যন্ত স্পষ্ট—"আমাদের দেশে এক্ষণে যে সমস্ত নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে নাটকোচিত প্রকৃত রচনার নিতান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু বাবুও এ অভাব-দোষ হইতে এককালে মুক্ত নহেন। ···কিন্তু নিমে দত্তের রচনা বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। সে নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে শত সাধুবাদ করি।"[১৬] দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য-প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে এত প্রশস্তি উচ্চারণের সময়ও ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য 'সধবার একাদশী'র বহিরাঙ্গিক কৌতুক ও ব্যঙ্গধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মন্তব্য করেন—"লোক সমাজের আদর্শস্থানীয় পুণ্যশ্লোকস্বরূপ কোন পাত্রের রচনা না করিয়া, নিমে দত্তের সদৃশ মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারীর রচনা করিয়াছেন।"[১৭] সুতরাং নিমচাঁদ এমন ব্যক্তি নন, 'a man who enjoys prosperity and a high reputation'[১৮], বা উচ্চদরের নায়ক নন বলে শেষপর্যন্ত ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথাবদ্ধ ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি করেছেন: "সধবার একাদশী' প্রহসন বটে, কিন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবার পক্ষে এই প্রহসনের অপেক্ষা অধিক কার্যকরী গ্রন্থ অল্পই দেখিয়াছি।"[১৯] সুতরাং তিনি একদিকে উনিশ শতকী প্রহসন ও নক্সা-ধারার বহিরাশ্রয়ী মিল, অন্যদিকে এর মধ্যে পাশ্চাত্য ট্রাজিক-সংবিদের উপস্থিতির দ্বৈত অস্তিত্বে স্পষ্টতঃই দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছেন।

সমসাময়িক কালের সাহিত্য-সমালোচক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন 'সধবার একাদশী'র আভ্যন্তর ট্রাজিক-রস উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়ে একে নিছক প্রহসন রূপে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে 'সধবার একাদশী' অসার্থক প্রহসন এবং সৃষ্টিকর্ম হিসেবে একটি 'জঘন্য পদার্থ'। কারণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংজ্ঞানুসারে প্রহসন হচ্ছে, "সমাজ-প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ অন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্রশোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করা।"[২০] তাঁর ধারণা, দীনবন্ধু মিত্র প্রহসনের উপর্যুক্ত 'মুখ্য উদ্দেশ্য' অতিক্রম করে 'কতকগুলি বখামী'র 'সংঘ' রচনা করেছেন। নীতিনিষ্ঠ সমালোচক অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় দীনবন্ধুকে তিরস্কার করে মন্তব্য করেন, "ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসন রচনার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।"[২১] 'সধবার একাদশী'র মতো নতুন বিষয় ও রীতির নাট্যপ্রয়াসের তাৎপর্য রক্ষণশীল সাহিত্যরসিক রামগতি ন্যায়রত্নের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য-সাহিত্যে প্রাজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে এর নতুনত্ব ও ব্যতিক্রমধর্ম উপলব্ধি করা সহজ ছিল। অথচ তিনিও রামগতি ন্যায়রত্নের প্রতিধ্বনি করে মন্তব্য করেন, "এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে।"[২২] দীনবন্ধু মিত্রের জীবিত কালে 'সধবার একাদশী'র মূল্যায়ন করেন (১২৭৯) ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, মৃত্যুর এক বৎসর পর (১২৮১) রামগতি ন্যায়রত্ন এবং মৃত্যুর তিন বৎসর পর (১২৮৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ-পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা'[২৩] শীর্ষক নিবন্ধটি রচনা করেন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হলেও, এই সংস্করণের আখ্যাপত্র সন্নিবেশিত থাকলে তা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাঁদের গ্রন্থে সংযোজন করতেন। কারণ তাঁরা উপর্যুক্ত দ্বিতীয় সংস্করণকে তাঁদের সম্পাদিত 'গ্রন্থাবলী'তে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেছেন। প্রথম সংস্করণ তাঁরা সংগ্রহ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। পরবর্তীকালেও প্রথম সংস্করণের কোন অস্তিত্ব লাভ করা যায়নি। সুতরাং কোনক্রমেই অনুমান করা যায় না যে, স্বয়ং নাট্যকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থটিকে 'নাটক' না 'প্রহসন' অভিধায় আখ্যায়িত করেছিলেন।[২৪] আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, সমকালীন

সমাজ সংস্কারমূলক নক্সার উপাদান-উপকরণ, বিশেষ করে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিষয়াংশের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে বঙ্কিম প্রমুখ 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন বলে ভ্রান্তির পরিচয় দেন। আর এই ভ্রান্তির বারংবার পুনরাবৃত্তি সমকাল পর্যন্ত হয়েছে প্রসারিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) 'বান্ধব'[২৫] পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে বাংলা নাটকের অন্তর্প্রকৃতি সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, এ-প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়। তিনি বলেন, "মানসিক আবেগের অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতই নাটকের জীবন। এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত আবেগ নাই। মানসিক হ্রদে সামান্য কুলকুলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের সহিত কল্লোল নাই। আমরা এখন বাতুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি, সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। আমাদের দেশে ভাল নাটক নাই, অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে।"[২৬] উনিশ শতকের সমাজ-প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ কালীপ্রসন্ন ঘোষ শেক্সপীয়রীয় আদর্শের নিখুঁত ট্রাজেডির অনুপস্থিতি দেখে বাংলা নাটক-বিষয়ে এ-জাতীয় হতাশার বাণী ব্যক্ত করেন। ঔপনিবেশিক পরিবেশে লালিত ব্যক্তির মানস-সঙ্কট যে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক সমাজের উর্ঠতি-পর্যায়ের ব্যক্তির মতো শক্তি, সামর্থ্য এবং সংবেদনায় স্বাবলম্ব হতে পারে না, এ সত্য কোন শৃংখলিত বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অবগত হওয়া কষ্টসাধ্য। এই সীমাবদ্ধতা থেকে কালীপ্রসন্ন ঘোষও মুক্ত নন বলে দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তকারী সৃষ্টিকর্মসমূহের আভ্যন্তর দুর্বলতা ও অন্তঃঅসঙ্গতির কারণ উপলব্ধি না করে মন্তব্য করেন, "'নীলদর্পণ' রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্যরস তরল হইতে থাকে। তাহার পরিচয়----'সধবার একদশী'।··· 'নবীন তপস্বিনী'তে নাটক লিখিতে প্রহসন করিয়াছেন, আবার 'জামাই বারিক' প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক করিয়াছেন।"[২৭] এতদ্ব্যতীত, সমকালে কোন জীবন-ঘনিষ্ঠ ও জীবন-যন্ত্রণাক্ষুব্ধ শিল্পকর্মে যদি সমাজ-জীবনের উপরিতলের ছায়াপাত ঘটে, তাহলে তাকে নক্সা বা প্রহসন বলে অভিহিত করার একটা হাস্যকর প্রবণতা বিদ্বৎমহলের একটি অংশে দৃষ্ট হয়। এ-কারণে কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'সধবার একাদশী'র

মতো জাতীয় জীবনের পরাজয়, অশ্রুপাত এবং ব্যক্তিজীবনের অন্তর্গত রক্তক্ষরণের বিশ্বস্ত রূপচিত্রকে কাব্যরসে 'তরল' বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁর মতে, "প্রহসনে, দীনবন্ধু অদ্বিতীয়"।[২৮] 'নিমেদত্ত স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান, তাহার সম্মুখে কাঁচপাত্রে নরকাগ্নি। নিমচাঁদ, এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নরকাগ্নি দিবারাত্রি গলধঃকরণ করিতেছে" বলে তিনি নিমচাঁদ-চরিত্রের অন্তর্লক্ষণ উন্মোচনে বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দিলেও, চরিত্রটির এই আত্মযন্ত্রণা ও পতনের পরিপ্রেক্ষিত বিচারে নির্ভুল ও নির্দ্বন্দ্ব নন। ফলে এর মধ্যে তিনি কোন ট্রাজেডির সন্ধান লাভ করেননি। এ-কারণে নিমচাঁদের 'মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতি'র তীর্যক উৎসারণকে কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রহসনের অতিরঞ্জিত বাক্যালাপ ভেবে যুগান্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন নাট্য-সমালোচকদের এ জাতীয় মূল্যায়নে প্রভাবান্বিত হয়েই গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকের উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে কোন বিতর্কে না গিয়ে 'সধবার একাদশী'কে 'সমাজচিত্র' আখ্যায়িত করে দায়মুক্ত হন।

একইভাবে দায়িত্ব-মুক্ত হয়েছেন বিংশ শতাব্দীর অনেক আলোচক। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে কোন তথ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকে সিদ্ধান্ত করেছেন 'সধবার একাদশী প্রহসন'।[২৯] আমাদের ধারণা, সুকুমার সেন নাটকটির প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র না দেখার ফলে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দ্বিধামুক্ত নন। পূর্বসুরিদের অনুসরণে 'সধবার একাদশী'কে 'প্রহসন' হিসেবে নির্বাচন করলেও বক্তব্যটি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে উপস্থাপন করায় তাঁর দ্বিধান্বিত মনোভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ক্ষেত্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'দীনবন্ধু-রচনাবলী'র ভূমিকায়ও সম্পাদক 'সধবার একাদশী'র নাট্যবৈশিষ্ট্য বিষয়ে মীমাংসিত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেননি। 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন বলে স্বীকার করেও স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হতে পেরে মন্তব্য করেছেন যে, "প্রকৃতই দীনবন্ধুর একটিমাত্র প্রহসনে ঘনপিনদ্ধ কাহিনী নেই, প্রচলিত রীতির কাহিনী ঐক্য নেই। অনেকটা নক্সার লক্ষণ আছে।"[৩০] এ পর্যন্ত এসেও ক্ষেত্র গুপ্ত সন্তুষ্ট হতে না পেরে শেষপর্যন্ত ধারণা করেছেন যে দীনবন্ধু আলোচ্য সৃষ্টিকর্মে "হয়তো

নূতন রীতিতে unity of action-এর স্থানে unity of impression-এর কোন স্বতন্ত্র আদর্শ অনুসরণ করতে··· চেয়েছিলেন।”[৩১] তাঁর এই অনুমান সত্যস্পর্শী হলেও, তাকে তিনি চূড়ান্তভাবে প্রমাণসাপেক্ষ করে উপস্থাপন করেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এ সত্য স্পষ্ট যে, শুরু থেকেই নাটকটির বক্তব্য, বিষয় ও শিল্পরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত বিতর্কিত প্রস্তাবনা নির্মিত হয়েছে। এতদ্বিষয়ে শ্রী সুশীলকুমার দে'র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ধারণা, “নাট্যকারের যে আত্মনিরপেক্ষ বস্তুসচেতনা ও স্নিগ্ধ-গভীর সমবেদনা”,[৩২] তা দীনবন্ধুর আলোচ্য নাটকের মর্মবস্তু---এ-কারণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপন্থী, রোমান্সবিলাসী এবং নীতিনিষ্ঠ সমালোচকবৃন্দ 'সধবার একাদশী'র বিষয়বস্তু সম্পর্কে হয়ে ওঠেন শ্রদ্ধাহীন। ফলে একে নাটক বলা অপেক্ষা প্রহসনের প্রশংসা বিতরণে তাঁরা অকৃপণ হস্ত প্রসারিত করেছেন। বঙ্কিম-অনুসারী সমালোচক রমেশচন্দ্র দত্ত তাই দীনবন্ধু মিত্রকে “...known to his country men more as a humourist and satirist than as a serious dramatic writer”[৩৩] বলে মন্তব্য প্রকাশে কুন্ঠিত হননি। কিন্তু প্রভু গুহঠাকুরতা দীনবন্ধু মিত্রকে 'born humourist' বলা সত্ত্বেও আলোচ্য নাটকে বর্ণনাতীত 'অতিরঞ্জন', 'অশ্লীলতা' এবং 'comic spirit' ইত্যাদি 'বিরক্তিকর উপাদান' সন্নিবেশিত থাকার নামে একে 'comedy' বলে শ্রেণীকরণ করেছেন।[৩৪] পরবর্তী কালে অজিতকুমার ঘোষ এলারভাইস নিকলের 'The Theatre and Dramatic Theory' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, ফার্সে চরিত্র মুখ্য বিষয় নয়, ঘটনাসর্বস্বতা এর বৈশিষ্ট্য ---এই দৃষ্টিকোণে 'সধবার একাদশী' চরিত্রমুখ্য কমেডি। আরো নির্দিষ্ট করে তিনি বলেছেন যে, “শ্রেষ্ঠ কমেডি comedy of manners নয়, comedy of satire নয়, তা হল 'comedy of humour.'[৩৫] 'সধবার একাদশী' অজিতকুমার ঘোষের মতে “comedy of humour.” পক্ষান্তরে দীনবন্ধু-গবেষক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত---'সধবার একাদশী' 'comedy of manners' ;[৩৬] কিন্তু নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী' গ্রন্থে উপর্যুক্ত মন্তব্যসমূহ উপেক্ষা করে একে নিছক 'কমেডি' বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছেন।[৩৭] নির্মলেন্দু ভৌমিক এখানেই ইতি না টেনে এর মধ্যে

আবার একই সঙ্গে প্রহসন-রূপের উপাদান অন্বেষণে ব্রতী হয়েছেন। প্রহসনের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুসারে এর মধ্যে প্রহসন-ধর্মের লক্ষণ আবিষ্কারেও তিনি সার্থকতার দাবী করেছেন। একই নাটকে এই বহুবিধ বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকার কারণ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: "উনবিংশ শতকের বাঙালীর কাছে কমেডি ও প্রহসনের মধ্যে ভেদবোধ তেমন না থাকায় রচনায় ও আস্বাদনেও তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে।"[৩৮] এ-সিদ্ধান্ত সাধারণভাবে সকলের জন্য যথার্থ নয়। 'ভেদবোধ' ছিল না এমন সরল মূল্যায়ন উনিশ শতকের বাঙালি মনীষাকে কোনক্রমে অলঙ্কৃত করে না। 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র উৎসর্গপত্রে দীনবন্ধু মিত্র অত্যন্ত সচেতনভাবে 'প্রহসন' শব্দটি লিখলেন এবং 'নীলদর্পণ' 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতির আখ্যাপত্রে 'নাটক' শব্দটি লিখলেন কোন্ অভিপ্রায় থেকে? স্মরণীয়, উনিশ শতকের বিদ্বৎসমাজ শুধুমাত্র শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডি অধ্যয়ন ও অভিনয় করেননি, পাশ্চাত্য প্রহসন নাট্য ও তার রূপরীতি বিষয়েও ছিলেন অবহিত। প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ-নাট্যের যাত্রা শুরু হয় প্রহসনের হাত ধরে। গেরাসিম-লেবেডফ-অনূদিত নাট্যদ্বয়ের মধ্যে একটি মলিয়ারের প্রহসন ছিল, এ সত্য ইতিহাস-সমর্থিত।[৩৯] আমাদের ধারণা, উনিশ শতকের মধ্যপর্যায় অতিক্রম করার পরও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উপরিতলে বিদ্যমান পরস্পর বিরুদ্ধ ও অন্তর্বিরোধময় স্রোতধারায় ছিল অন্তঃঅসঙ্গতির বীজ। এ-জন্য যেমন সমাজাদর্শ, ভাবাদর্শ, সাহিত্যাদর্শ এবং ব্যক্তির অন্তর্ময় চেতনাদর্শে ছিল স্ববিরোধিতা; তেমনি সময় ও সমাজ শৃঙ্খলিত ব্যক্তিমানস-উদ্ভূত শিল্পকর্মেও প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিধান্বিত যুগধর্ম। এ-কারণে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের ঘটনাংশে এবং বহিরাবরণে লেগেছে প্রহসনের ছাপ। এতদ্‌সত্ত্বেও 'নবীন তপস্বিনী'কে কিন্তু প্রহসন বলা যায় না। তেমনি 'সধবার একাদশী' নাটকে যুগপৎ কমেডি এবং প্রহসন নাট্যের প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা গেলেও অন্তর্স্বভাবে এটি দীনবন্ধুর ব্যতিক্রম-ধর্মী নাটক। উপরিতলের কৌতুকধর্ম দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে অন্তস্তলে বহমান রক্তাক্ত ব্যক্তিত্বের পরাজয়ের ট্রাজেডিকে উপেক্ষা করে অনেকে তাই 'সধবার একাদশী'কে প্রহসনের বেশী কিছু মূল্য দিতে অনাগ্রহী।

'সধবার একাদশী' যে প্রহসন নয়, নবজাত নাট্যরীতির উদাহরণ, তা পরোক্ষভাবে হলেও, দীনবন্ধু-সমালোচনা ধারায় অনেকে স্বীকার

করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, নিম্নোক্ত কারণে 'সধবার একাদশী' সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ বিভ্রান্ত হয়েছেন: ১. নাটকটির বহিরাবরণে প্রহসন ধর্মের নির্মোক, বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিক ব্যবহার এবং ব্যতি-ক্রমধর্মী বিন্যাসরীতির অনন্য সাফল্য; ২. শেক্সপীয়রীয় আদর্শের যান্ত্রিক ব্যবহার প্রত্যাশা এবং পাশ্চাত্য শিল্পরীতির প্রথাবদ্ধ সূত্রানুসারে নাটকটির শিল্পরূপ অন্বেষণ; ৩. প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের অনু-পস্থিতিতে 'সধবার একাদশী' নাটক না প্রহসন এতদ্বিষয়ে প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের অভাব; এবং ৪. ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক পরিবেশে অসম-বিকশিত সমাজ-কাঠামো উদ্ভূত বাংলার বিদ্বৎসমাজের আভ্য-ন্তর সঙ্কট, চিত্তলোকের স্ববিরোধিতা এবং চেতনালোকের জটিলতর বুদ্বুদে সমকালীন সৃষ্টিকর্ম শক্তিতে খর্বিত, চরিত্রে পরাশ্রয়ী, রস ও রুচিবোধে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে; এ-জন্যে একদিকে জীবনের লঘুধর্মী রঙ্গ-ব্যঙ্গ, অন্যদিকে জীবনের জটিলতর যন্ত্রণা, অনিবার্য পরাভব—একই সঙ্গে একই শিল্পকর্মে হয়েছে রূপান্বিত। ফলে ট্রাজে-ডির উচ্চ মহিমার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তরল হাস্যকৌতুক, কমেডির মধ্যে করুণভাব, প্রহসনের মধ্যে চরিত্রধর্ম। কোন সৃষ্টিকর্মের বিচিত্র রসধারার একটি প্রান্তকে মৌল প্রতিপাদ্য বিবেচনার প্রবণতা থেকে জন্ম লাভ করেছে তার খণ্ডিত বিচার। উপর্যুক্ত কারণে 'সধবার একাদশী' নাটক না প্রহসন এই ভ্রান্তির উদ্ভব।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, প্রথমাবধি 'সধবার একাদশী'কে প্রহসন হিসেবে চিহ্নিত করার একটা ঝোঁক বিদ্যমান থাকলেও শেষপর্যন্ত অনেক গবেষকই এর নাটক-গুণ অস্বীকার করতে পারেননি। তার অনন্য নাটক-গুণের জন্যেই কেউ একে কমেডি, কেউ কমেডি অফ ম্যানার্স, কেউবা কমেডি অফ হিউমার, আবার কেউ পরোক্ষে হলেও একে নাটক নামে ভূষিত করেছেন। যাঁরা নাটক অভিধা প্রদানে দ্বিধান্বিত, তাঁরা কমেডি নামাকরণে সাহসী, কারণ কথিত 'প্রহসন'কে কমেডি শিরোপা প্রদান সহজ। কেননা মাত্রাভেদে কমেডি প্রহসন এবং প্রহসন কমেডি হতে পারে। তাছাড়া কমেডিতে চরিত্র অপেক্ষা চরিত্রের রূপকই সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং এ-কারণে সকলে কমবেশী হিউমার সৃষ্টি করে থাকেন।[৪০] 'সধবার একাদশী'র মধ্যে সেই হিউমারের উপস্থিতি বোধ করি

বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কমেডি আখ্যা দিতে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু নাটকটির অন্তর্ধর্মে এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের অন্তস্তলে যে কালাগ্নি তাকে উপেক্ষা করে নায়কের পরিশীলিত বুদ্ধিবাদিতা, মস্তিষ্ক-চর্চা ও মননধর্মকে প্রধান বিবেচনা করে 'সধবার একাদশী'কে কমেডি অফ ম্যানার্স বা কমেডি অফ হিউমার বলা খণ্ডিত বিচার মাত্র। আমাদের বিশ্বাস, নাটকটির প্রাণধর্ম এবং চরিত্র-সত্তার বৈশিষ্ট্য নিহিত এর সময় ও সমাজ-সম্পৃক্ত জাতীয় জীবনের অমোঘ ট্র্যাজেডির মধ্যে। পক্ষান্তরে শতাব্দীর বেদনাবোধকে সূত্রায়িত করার দায়িত্ব ও পরিশ্রমের ঝুঁকি নেবার অনীহা থেকেই কমেডি না প্রহসন এই তত্ত্বালোচনার সূত্রপাত। অথচ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র অনেক পূর্বেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় 'সধবার একাদশী'র পটভূমি এবং নাট্যগুণ বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন: "যেমন দেশের নিরক্ষর প্রজা-মণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া, সেই দুঃখ বিমোচনের জন্য পিতৃদেব 'নীলদর্পণ' রচনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ দেশের তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর দুঃখে কাতর হইয়া 'সধবার একাদশী' রচনা করেন। ···তদানীন্তন সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া পিতৃদেবের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। বর্তমান অবস্থার উন্নতির জন্য এবং ভবিষ্যৎ অমঙ্গল নিবারণের জন্য তিনি সাহিত্যের আশ্রয় লইলেন। এই অধঃপতনের নিখুঁত চিত্র সমাজের সমীপে উপস্থিত করিলে কল্যাণ হইবে, এই আশায় আবার লেখনী ধরিলেন। শরীরে গলিত গন্ধময় ক্ষতস্থান দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে এবং তাহার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করে, সমাজের শরীরে ক্ষতস্থান দেখাইয়া তাহাকে সচেতন করিবার জন্য তাই দীনবন্ধু শিক্ষিত-মণ্ডলীর করে দ্বিতীয় দর্পণ অর্পণ করিলেন। সেই দর্পণ 'সধবার একাদশী'।"[৪১] এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরাও এক মত যে, 'নীলদর্পণের' মতো 'সধবার একাদশী' একটি সমাজ-দর্পণমূলক নাটক। 'নীলদর্পণ' যেমন উনিশ শতকের আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার বাস্তব চিত্র, তেমনি 'সধবার একাদশী'ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার অন্তর্সত্য। এই দুটি চিত্রের মাধ্যমে দীনবন্ধু মিত্র উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রাম ও নগর জীবনের সামগ্রিক বাস্তবতাকে রূপময় করে তোলেন। 'সধবার একাদশী'তেও এক ধরনের 'stern reality'-কে প্রতিপাদ্য করা হয়েছে। মদ্যপান করে মাতলামী এর অনুষঙ্গ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত-শ্রেণী তথা বিত্তহীন বিদ্বৎশ্রেণীর ট্রাজেডি এর কঠোর বাস্তবতা। সুতরাং একে নাটক না বলে প্রহসন বা কমেডি বলার যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী' অন্তর্গত 'সধবার একাদশী'র ভূমিকায় সর্বপ্রথম 'প্রহসন' শব্দ পরিত্যাগ করে 'নাটক' শব্দ গ্রহণ করেন। তাঁদের মতে, "আসলে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটক,··· দীনবন্ধু এই নাটকটিতে স্বীয় ক্ষমতার চরম প্রকাশ দেখাইয়াছেন। মনুষ্য-চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা-প্রসূত নির্লিপ্ততা বা detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় শেক্সপীয়রীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ সকল দিক্ বিচার করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষায় একমাত্র 'সধবার একাদশী'কেই খাঁটি নাটক আখ্যা দেওয়া যায়।"[৪২] সুশীলকুমার দে 'সধবার একাদশী'কে উচ্চাঙ্গের নাটক বলে গ্রহণ করতে আগ্রহী। তাঁর মতে, "দীনবন্ধুর হাস্যরস ও নাট্যপ্রতিভার চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে তাঁহার 'সধবার একাদশী' নাটকে। ···সমসাময়িক উপকরণ দীনবন্ধুকে প্রেরিত করিয়াছিল, এবং মধুসূদনের প্রহসনের আদর্শও সম্মুখে ছিল, কিন্তু এই উদ্দেশ্য ও আদর্শের ঊর্ধ্বে দীনবন্ধুর নাটকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও রচনার সার্থকতায় চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। চরিত্র-চিত্রণে, ঘটনা-সংস্থানে, লিপি-কৌশলে, কেবল তুচ্ছ কৌতুকের নয় উৎকৃষ্ট হাস্যরসের নিদর্শনে, ক্ষুদ্র হইলেও নিছক নাটক হিসাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অতি অল্প সম্পদের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।"[৪৩] উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য সত্যস্পর্শী হলেও, কোন্ বিষয়-বস্তুগত বৈশিষ্ট্য, নির্মাণ কৌশলগত স্বাতন্ত্র্য এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা 'সধবার একাদশী'কে বাঙালির শ্রেষ্ঠ নাট্য-সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার বিস্তৃত ও তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ সেখানে অনুপস্থিত। আমাদের মতে, দীনবন্ধু অত্যন্ত সতর্কভাবে তাঁর প্রথম পর্যায়ের তিনটি নাটক রচনা করেন। তিনটি নাটকের বিষয়বস্তুই তাঁর সমাজ-অভিজ্ঞ, জনজীবনমূল-সম্পৃক্ত এবং দেশ-কাল-ইতিহাস সচেতন প্রগতিশীল মননচিন্তার যোগফলে নির্মিত। 'নীলদর্পণে' উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে শৃঙ্খলিত কৃষক-জীবনের প্রতিবাদ ও পরাভব; 'নবীন তপস্বিনী'তে সমকালীন নবজাগ্রত বাঙালির নব্য নারীমুক্তির চিন্তা, গার্হস্থ্য জীবনে নতুন নারীর দাম্পত্য-সম্পর্ক ও

প্রণয়-সম্পর্কের সামাজিক রূপ এবং তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার সাধনা; 'সধবার একাদশী'তে উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত স্ফীত মধ্যবিত্তের আশাভঙ্গ, পরাজয় এবং আত্মবিনাশের ট্রাজেডি চিত্রিত হয়েছে। উপর্যুক্ত সামগ্রিক পটভূমিকায় 'সধবার একাদশী'কে বিবেচনা না-করায় অনেক সমালোচক একে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' প্রহসনের পরবর্তী রচনা বলে নির্দেশ করছেন। ফলে 'সধবার একাদশী' নাটকের ব্যতিক্রমী শিল্প-অভিপ্রায় বিশ্লেষণ সামগ্রিকভাবে হয়েছে বিঘ্নিত।

অথচ এ-সত্য অনস্বীকার্য যে, মৌলিক প্রতিভান শক্তির অধিকারী, প্রজ্ঞাবান এবং মানবকল্যাণ ধর্মে নিবেদিত নাট্যকার স্বীয় শক্তি বলেই সংজ্ঞানুসারী না হয়ে নতুন ইতিহাসের নির্মাতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সে-জন্যে তাঁর সৃষ্টিলোকের ভাব-সম্পদ ও শিল্প-প্রকরণ স্বাতন্ত্র্যে হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল। তাঁর শিল্পকর্মের রহস্যময়, জটিল এবং অনন্য প্রান্তসমূহে সমাজজ্ঞান, কালজ্ঞান এবং ইতিহাসচেতনা অভিনব ছায়া-প্রচ্ছায়া বিস্তার করে। এ-কারণে 'সধবার একাদশী'র সচেতন প্রতিপাদ্যও নাট্যকারের মানস-সংশ্লেষিত সমসাময়িক যুগধর্মের প্রতি-ফলনের যোগফলে যেমন এর শিল্পসিদ্ধিকে অভিনবত্ব দান করেছে, তেমনি প্রথানুসারী নাট্যধারা থেকে করেছে স্বতন্ত্র। 'সধবার একাদশী'র স্বাতন্ত্র্যধর্ম নিম্নোক্ত সূত্রানুসারে উপস্থাপন করা যায়: ১. পঞ্চাঙ্ক নাটকের প্রথাবদ্ধ ব্যতিক্রম ধর্ম, চরিত্রায়ণ পদ্ধতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ধর্ম, অন্তর্মনস্ক সংলাপ উচ্চারণ-রীতি, চেতনাময় ও চিত্রময় দৃশ্য সংযোজন, খণ্ডচিত্র ও টাইপ চরিত্র সমন্বয়ে অখণ্ড ব্যঞ্জনাসৃষ্টিই এর বিতর্কিত শিল্পকৌশল; ২. মাইকেলের প্রহসনের জনপ্রিয় উপকরণ ও উপাদান গ্রহণ এবং সমাজ-চিত্রমূলক নক্সার ঘটনাংশ ও কৌতুকধর্ম এর রস-নিষ্পত্তিগত বিভ্রান্তির জনক। অথচ উপর্যুক্ত দ্বিবিধ কেন্দ্রবিন্দু থেকে 'সধবার একাদশী'র অধিকাংশ মূল্যায়ন নির্মিত বলে প্রথমতঃ পঞ্চ-সন্ধির শেক্সপীয়রীয় ফর্মে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দুরূহ হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে প্রহসনের সমকালীন অনুসৃত দৃশ্যযোজনার সাদৃশ্যে একে প্রহসন আখ্যা দেওয়া হয়েছে সহজ। দ্বিতীয়তঃ নাট্য-বিধৃত humour, satire, বেশ্যানুরক্তি, মদ্যাসক্তি ও বিদ্যাহীন বিত্তের সামাজিক দাপট, সমকালীন কৌতুক-সর্বস্ব নক্সা, ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন এবং বর্ণনাত্মক সংবাদ-চিত্রের রঙ্গ-ব্যঙ্গের প্রতিফলনের জন্যও অনেকে একে হাস্যরসাত্মক প্রহসন

বা সরস-পরিণামী কমেডি বলে ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নক্শায় সাংবাদিকতা, প্রহসনের ঘটনা-সর্বস্বতা এবং কমেডির আনন্দময় উপস্থাপনা 'সধবার একাদশী'র মৌল চরিত্র নয়। বরং ভিন্নতর আঙ্গিক-উদ্ভাবনা, মননশীল সংলাপের উৎকর্ষ, ব্যঞ্জনাময় রসপরিণতি এবং 'নবজাগ্রত' বাঙালি মধ্যবিত্তের পরাজয় ও পরিণাম নির্দেশ এ-নাটকের মৌল প্রতিপাদ্য। আত্মহনন, আত্মখনন এবং আত্ম-উন্মোচনে বেদনার্ত, অশ্রুসিক্ত এবং রক্তাক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমচাঁদ। উনিশ শতকের পরাজিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরূপে নিমচাঁদের চরিত্রকে স্পষ্ট ও সক্রিয় করার কৌশল হিসেবে দীনবন্ধু মিত্র চিত্ররীতির ও ব্যঞ্জনারীতির উপর্যুক্ত অভিনব নাট্যরীতি গ্রহণ করেন। এই শিল্পরীতির সার্থকতা প্রকৃতপ্রস্তাবে 'সধবার একাদশী'র বিষয়বস্তুগত স্বাতন্ত্র্য এবং নির্মাণ-কৌশলগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনুসন্ধেয়।

দুই

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্যায়-অতিক্রান্ত ক্রমশঃ স্ফীত মধ্যবিত্ত সমাজের স্বপ্নভঙ্গের ট্রাজেডি 'সধবার একাদশী'র বিষয়বস্তু। শতাব্দীর বিত্ত-কৌলীন্যের বিপরীতে নিমচাঁদের বিদ্যাগৌরব ও বিত্ত-ব্যর্থতা-উদ্ভূত আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিধ্বস্ত বাসনা, ছিন্নমূল জীবন যাপনের গ্লানি ও পরাশ্রয়ে মোসাহেব-বৃত্তির যন্ত্রণার দৃশ্যকাব্য 'সধবার একাদশী'। বিরুদ্ধ সমাজের জতুগৃহে প্রজ্জ্বলন্ত চিত্তদাহ ও অন্তর্সত্তায় রক্তাক্ত আত্ম-উন্মোচন নাটকটির প্রধান শিল্পগুণ। এ-নাটকের স্বল্প পরিসরে উনিশ শতকী সময়-সন্ধি ও জটিলতর সমাজগ্রন্থি অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে উচ্চারিত। সুতরাং 'সধবার একাদশী'র বিষয়-স্বরূপ উন্মোচনের জন্য সমসাময়িক দেশকালের পরিচয়, সামান্য পুনরুক্তি হলেও, পুনর্বিশ্লেষণ আবশ্যক।

উনিশ শতকের প্রথম পর্ব থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশ স্পষ্টতর হতে থাকে। পাশ্চাত্যে বিদ্যার্জনের আগ্রহ, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) এবং সর্বশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭) ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এ-সময় ভাগ্যান্বেষী বাঙালির মুদ্রাচেতনা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা তার

বিদ্যার্জন আকাঙক্ষার সঙ্গে পরস্পরিত-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিনয় ঘোষের (১৯১৭-১৯৮০) ভাষায়, 'money ও intellect-এর corelation স্থাপন'ই হলো তখনকার শিক্ষাবিস্তার ও বিদ্যার্জনের অন্তর্নিহিত অর্থনীতি।[৪৪] এ-কারণে রাজনৈতিক সিদ্ধিলাভের কূটকৌশল ও ঔপনিবেশিক প্রশাসন-প্রক্রিয়ার দূরপ্রসারী সাম্রাজ্য-স্বার্থ মেকলের শিক্ষা-নীতির অন্তর্বস্তু হলেও মধ্যবিত্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বিদ্যার্জন, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সংস্কার-আন্দোলন এবং ধনলিপ্সা চরিতার্থে তা কোন অন্তর্সঙ্কট ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। 'ফিলট্রেশন নীতির' জন্যে জনশিক্ষা সীমাবদ্ধ হলেও, প্রকৃতপক্ষে স্বীয় অন্তর্গরজে বিদ্যার্জনের দিকে বাঙালি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের ষাটের দশকেই বিদ্যাজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের সংখ্যা ঔপনিবেশিক প্রশাসন কাঠামোর চাকুরির অনুপাতে হয়ে পড়ে স্ফীত ও সম্প্রসারিত। এ-সময় এই উদ্বৃত্ত মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ শুরু হলেও, ব্রিটিশ প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল, পরিতৃপ্ত এবং অনুগত একদল চাকুরিজীবী উপর্যুক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্য থেকেই সৃষ্টি হয়।[৪৫]

সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জন এবং আভিজাত্যে ভূষিত হবার সমকালীন যে-সমস্ত পথ উন্মুক্ত ছিল তার মধ্যে প্রথমতঃ দালালি, মুৎসুদ্দিগিরি, বাণিজ্য এবং বাণিজ্যলব্ধ বিত্তে ভূস্বামী হওয়া ; দ্বিতীয়তঃ বিদ্যার্জনের মাধ্যমে চাকুরিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা এবং এই সূত্রে অর্থ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করা। তবে উভয় ক্ষেত্রে কমবেশী সঞ্চয় ছিল ইংরেজি বিদ্যা, অধ্যবসায় এবং বিষয়বুদ্ধি। বিদ্যা ও বিত্তের সমন্বয় ঘটলে তো কথাই নেই, কিন্তু যে-কোন প্রকারে বিত্ত সঞ্চয় করতে সমর্থ হলেও বিত্ত-কৌলীন্য লাভ ও সামাজিক শক্তি অর্জন সম্ভব ছিল।

রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ বিদ্যা ও বিত্তের মণিকাঞ্চন সংযোগে সামাজিক শক্তি অর্জন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দীনবন্ধু মিত্র প্রধানতঃ বিদ্যাকৌলীন্যে ভূষিত হন, তবে বিদ্যাসাগরের মধ্যে ধনতান্ত্রিক ব্যবসাবুদ্ধি এবং মানবধর্মের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়।[৪৬] এঁদের সংস্কার-আন্দোলন, শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস, স্বদেশ-মুক্তির বাসনা এবং সামাজিক মুক্তির বাণী মূলতঃ তাদের বিদ্যা ও

বিত্ত-উদ্ভূত সামাজিক শক্তি-কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যপর্যায় থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরিজীবনের 'স্বর্ণযুগের' কালান্তর শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ তার নিজস্ব নিয়মে বাঙালির 'নবজাগ্রত' জীবনধারণা এবং জীবনধারণ প্রক্রিয়াকে বিচলিত করে। সে উপলব্ধি করে— ১. পাশ্চাত্য ধনবাদী সভ্যতার মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ ও উজ্জীবিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বাস্তব ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দী। এ কারণে তার পাশ্চাত্যমোহ সর্বগ্রাসী ব্রিটিশ শাসনে ক্রমান্বয়ে হয়ে ওঠে স্বদেশ-মৃত্তিকা সংলগ্ন। নীলবিদ্রোহ এবং সিপাহীবিপ্লবের পটভূমিতে তার এই আত্মদ্বন্দ্ব এবং আত্ম-আবিষ্কার অনেকাংশে হয় স্পষ্ট। মেকলে-নির্দেশিত 'প্রভুভক্ত ভৃত্যের' তত্ত্ব নীল-বিদ্রোহে, ব্ল্যাক অ্যাক্টে, চাকুরির সীমাবদ্ধ পরিসরে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশঃ ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পর্কে হয়ে পড়ে অতি সতর্ক। উদারতাবাদী মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রত্যক্ষ করে পাশ্চাত্যদর্শনের মহান মানবতা, গণতন্ত্র এবং যুক্তিবাদ সাম্রাজ্য-স্বার্থে মূল্যহীন এবং অথর্ব বক্তৃতা মাত্র। ইংরেজের বিপ্লব-আতঙ্ক এবং বাঙালির আত্ম-আবিষ্কার-স্পৃহার সংঘাত উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বিদ্বৎসমাজকে তাই নতুন করে আলোড়িত করে। তারা অনুভব করে, বাণিজ্য-পুঁজি আর সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনের মধ্যে বন্দী মধ্যবিত্তশ্রেণী যেন ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় সত্যিই 'পোষা গরু'। ২. উচ্চপদের সরকারি চাকুরিসমূহ শ্বেতকায়দের জন্য সংরক্ষিত থাকায় উচ্চশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মমর্যাদাবোধ আহত হতে থাকে। পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ-শিক্ষিত ও যোগ্য চাকুরি-প্রার্থীর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর জন্যে সীমাবদ্ধ চাকুরির ক্ষেত্রটি আরো প্রতিযোগিতামূলক হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ ভালো চাকুরি হয়ে পড়ে দুষ্প্রাপ্য। এ কারণে, ঔপনিবেশিক পরিবেশে নিরাপদ জীবনের পরম আশ্রয় বলে গণ্য চাকুরি-নির্ভর জীবনও মধ্যবিত্তের জন্য হয়ে গেল দুঃস্বপ্ন। ৩. শোষণ ও শাসনের নিরাপত্তার কারণেই ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসকরা কোন ব্যাপক পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চাননি। এ-জন্যে তাঁরা এ-দেশের চিরস্থবির ও অচঞ্চল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর মধ্যেই ধনতান্ত্রিক শোষণের প্রক্রিয়া চালু করে। সামাজিক ক্ষমতার উৎসসমূহ, বিভিন্ন সামন্তমূলীয় সংগঠন এবং সনাতন রীতি-নীতির মধ্যে মধ্যশ্রেণী

পাশ্চাত্য সভ্যতার তরঙ্গে আন্দোলিত হলো বটে, কিন্তু তাঁদের মনোভূমি আমূলবিপ্লবের কোন তটরেখা আবিষ্কারে সমর্থ হলো না। এ-কারণে উনিশ শতকের বাঙালি বিদ্বৎসমাজের মানসলোকের ভিত্তিভূমিতে অবস্থিত ছিল পুরানো মূল্যবোধের প্রত্নপ্রতিমাসমূহ (arche-type), পক্ষান্তরে, উপরিতলে বিদ্যমান ছিল পাশ্চাত্য জীবনদর্শনের চারণ-ক্ষেত্র। এ-জন্যে আত্মবিরোধই হলো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অন্তর্স্বভাব। জাতিভেদ, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, কৌলীন্য-প্রথা বিষয়ে তার আন্দোলন এবং স্বদেশ-সাধনা, শিক্ষা-বিস্তার এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে উপর্যুক্ত স্ববিরোধিতা অত্যন্ত প্রকট।[৪৭]

বাঙালির উল্লিখিত তিনটি অন্তর্বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উনিশ শতকের আলোচ্য পর্বে তারা মূলতঃ দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়েছিলেন। প্রথমতঃ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সংঘাত; দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে সনাতন বিশ্বাসের অন্তর্মুখী সংঘাত। 'সধবার একাদশী'র নায়ক নিমচাঁদের আত্মাভিমান, অহঙ্কার, অবিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্তর্বিরোধ মূলতঃ উপর্যুক্ত জীবন-সত্যেরই রক্তাক্ত প্রতিভাস। উনিশ শতকের বিত্তবান সমাজের অন্তঃসারশূন্য আভিজাত্য, অপসংস্কৃতি এবং অপচিত জীবন-প্যাটার্নের পটভূমিকায় 'সধবার একাদশী' স্থাপন করায় নাটকটির মৌল-সঙ্কট সমাজশক্তিতে সংহত হয়েছে। দেশকাল, সমাজ, রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ভালমন্দ মিলিয়ে যে সমগ্র মানুষ, নিমচাঁদ সেই অখণ্ড মানুষ। দীনবন্ধু মিত্রের পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ মানুষের এই জাতীয় জীবনচিত্র আর কেউ নির্মাণ করেননি।[৪৮] রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থিত 'কলোনাইজেশন তত্ত্বের' ব্যর্থতার রূপচিত্র 'নীলদর্পণ' এবং বিত্তের নগদ মূল্য ও ধনতন্ত্রের পণ্যমূল্যের কাছে বিদ্যাশক্তির পরাভবজাত যন্ত্রণার রূপবন্ধ 'সধবার একাদশী'। এই দুটি নাটকের মাধ্যমে দীনবন্ধু মিত্র উনিশ শতকের আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক বাস্তবতাকে সামগ্রিকভাবে (total reality) নাট্য-বিষয় অন্তর্গত করেন। নাট্যকারের আবাল্য জীবন-অভিজ্ঞতা, ইতিহাসজ্ঞান এবং কালজ্ঞানের রসায়নে নির্মিত এই দুটি শিল্প-প্রতিমা। 'নীলদর্পণের' ট্রাজিক-সংবিদ বহির্মুখী

ঘটনাপ্রবাহের সংঘাতে মৃত্যুদৃশ্যে বর্ণিত, কিন্তু 'সধবার একাদশী'র ট্রাজেডি ব্যক্তির অন্তর্মুখী সংঘাতে ও তার অনুভূতিপুঞ্জের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় রক্তিম।

'সধবার একাদশী'র প্রথম সার্থক আলোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য নিমচাঁদের জীবন-জটিলতার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "উন্নতি কামনা বিফল" হয় বলে তার জীবন ব্যর্থতার পঙ্কে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে। কিন্তু বিফলতার যে-কারণ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য নির্দেশ করেছেন, তা যথার্থ বলে গ্রহণ করা যায় না। তাঁর মতে, "অপরিমিত মদ্যপানই বিফলতার জন্য" দায়ী।[৪৯] এই সিদ্ধান্ত নাটকটির আভ্যন্তর প্রমাণ এবং সমসাময়িক ইতিহাস-পরিপ্রেক্ষিত অনুমোদন করেনা। বস্তুতঃ এই ইতিহাসজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিল্পজ্ঞানের অস্পষ্টতার জন্য রামগতি ন্যায়রত্নের মতো সৎ লেখকও মন্তব্য করেন—"সধবার একা-দশী'-খানি মদের কথাতেই আবদ্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ।"[৫০] বরং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মদ্যপানের কারণ হিসেবে নিমচাঁদের 'বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃত শিক্ষা'[৫১] বিষয়ে যে-ইঙ্গিত করেছেন, তা সত্যস্পর্শী। কিন্তু তিনি তার মন্তব্যটির কোন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেননি। কালীপ্রসন্ন ঘোষ অনুভব করেছেন, নিমচাঁদ স্বর্গভ্রষ্ট দেবদূত, কলোনীর বীত স্বপ্ন, বিত্তব্যর্থতা এবং অবদমিত আকাঙ্ক্ষার নরকাগ্নিতে সে আত্মহননে নেশাগ্রস্ত। 'স্বর্গভ্রষ্ট সমাজ' এখানে শৃঙ্খলিত ঔপনিবেশিক জীবন এবং 'কাঁচপাত্রে নরকাগ্নি' মূলতঃ মদের পেয়ালা বা আত্মনিগ্রহের উপমান চিত্ররূপে চিন্তা করা হয়েছে।[৫২] কালী-প্রসন্ন ঘোষের এই ব্যাখ্যা আংশিক সত্য। কিন্তু এর পরই তিনি মন্তব্য করেন, "যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন; তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে নিমচাঁদকে পাঠান কেন? নিমচাঁদকে সেই হরিশ, সেই রামগোপাল মধ্যে স্থাপিত করিতে হয়। তবে নিমচাঁদ স্ফূর্তি পাইত।"[৫৩] এই মন্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমকালীন বাংলার সামগ্রিক বাস্তবতার প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে নিমচাঁদ-চরিত্র বিচার করেননি। দীনবন্ধু

নিঃসন্দেহে হরিশ্চন্দ্রের ও রামগোপাল ঘোষের মধ্যকার অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আমাদের মতে, দীনবন্ধু মিত্র কোন ব্যক্তির নয়, বরং একটি সামাজিক মনোভাবের পরিচয় ও জাতীয় অবক্ষয়ের চিত্র আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্যরূপে নির্বাচন করেন। সে-জন্য কেবল মাত্র মদ্যপানকে দীনবন্ধু কালের ব্যর্থতারূপে ভাবতে পারেননি। প্রকৃত পক্ষে মদ্যপানকে নিষ্ফল জীবনের অন্যায় প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সমকালদর্শী দীনবন্ধু ভালো করেই অবহিত ছিলেন যে, "...drunkenness was introduced amongst the native of Bengal through the influence of European example." [৫৪] উপনিবেশবাদী ইংরেজদের বন্ধনহীন রতিবিলাস, ভোগমত্ততা এবং স্থূল প্রমোদ-চর্চার অনুকরণে গড়ে ওঠে পরবর্তীকালের 'বাবু কালচার'। অটল সেই স্বল্প বিদ্যার অধিকারী ভোগোন্মত্ত বিত্তবান শ্রেণীর প্রতিনিধি। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে এদের মধ্যেও ধনতান্ত্রিক ভোগবাদ এবং 'বাবু কালচারের' ছিটেফোটা প্রভাব বিস্তার লাভ করে। এ-কারণে দেখা যায়, সংস্কার-আন্দোলনে, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ প্রচারে এবং সভ্যতার অহংকারের সঙ্গে সামন্তবাদী স্থূলতা ও উপনিবেশবাদী প্রমোদ-পিপাসা পরস্পরিত হয়ে এক অনু-করণ-সর্বস্ব জীবনাগ্রহ সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' প্রতিনিধিরাও সর্বাংশে এই সঙ্কর সংস্কৃতিচর্চা থেকে মুক্ত ছিলেন না। সেজন্য দেখা যায়, রামমোহনের মধ্যে একদিকে সংস্কার-আন্দোলন ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা, অন্যদিকে 'কলোনাইজেশন তত্ত্বের' সমর্থন, নিয়মিত মদ্যপান, নিকি বাঈজীর নৃত্য উপভোগ; ইয়ং বেঙ্গলদের একদিকে যুক্তিবাদ ও সংস্কারদ্রোহ, অন্যদিকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা' ও 'উদ্দামতা'। এই আত্ম-অসঙ্গতি, বিধ্বস্ত জীবন-অভীপ্সা এবং মননধর্মে ক্ষতবিক্ষত 'নবজাগ্রত' ব্যক্তিসত্তার সামনে পরশাসনের বিড়ম্বনা মধ্যবিত্ত-মানসকে নিশ্চেতন আত্মক্ষয়ের পথে ঠেলে দেয়। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের মাধ্যমে দীনবন্ধু জাতীয় জীবনের এই পরাভবকে আমোদ বলে গ্রহণ করেননি। নিমচাঁদের বিবেক, আত্ম-মর্যাদাবোধ এবং তার আত্মঘোষণার অহঙ্কারের মাধ্যমে তিনি বিদ্রোহের বাণী প্রচার করেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিবেশের সুকঠিন

প্রাচীরে মাথাকুটে আহত সিংহের মতো নিষ্ফল গর্জন করা ছাড়া এই বিদ্রোহের অন্য কোন পরিণাম হতে পারে না। ন্যায়ের সংগ্রামে হরিশ্চন্দ্রের অকালপ্রয়াণ, মাইকেল মধুসূদনের ট্রাজিক-মৃত্যু এবং স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের অপমৃত্যু মূলতঃ শৃঙ্খলিত-জীবনের অকাল-অবসান ছাড়া অন্য কিছু নয়। দেশ-কালের এই সামগ্রিক পটভূমিকা থেকে দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'র নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন বলে, নিমচাঁদ কোন একক ব্যক্তি না হয়ে, যুগধর্মের করুণ পরিণামরূপে চিহ্নিত হয়েছে। সময় ও সমাজ-শাসিত আত্ম-চেতনা, মধ্যবিত্তের জাগ্রত সংস্কার-দ্রোহ, রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের কর্মপ্রতিভা, মাইকেল, বঙ্কিম এবং বিদ্যাসাগরের ভাবয়িত্রী-প্রজ্ঞা এবং বিত্তবান শ্রেণীর অহঙ্কার, অশ্লীল প্রণয়-ক্রীড়া, বর্ণ ও বিত্ত-কৌলীন্য-জাত সামন্তমূলীয় দম্ভ তথা যুগআহরিত পরস্পর-বিরুদ্ধ জীবনতরঙ্গের বিশ্বস্ত অন্তর্বয়ন লক্ষ্য করি 'সধবার একাদশী' নাটকে। একদিকে জীবনের সুস্থ ও সুস্থির আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে পরজীবী, পরাশ্রিত ও পরাজিত জীবনাবেগ এবং জীবনজটিলতার সময়-সন্ধি কেন্দ্রীয় চরিত্রকে আশ্রয় করে চেতনাময়, ভাবময় ও ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে বলে 'সধবার একাদশী'র শিল্পধর্ম ও রসনিষ্পত্তি হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী। ব্যক্তির চেতনা-প্রবাহে ও অস্তিত্বে ভাসমান স্বপ্নজাগরণ, তার দিনরাত্রির ভাবনাবিন্দুর রক্তাক্ত নীলপ্রবাহ, মনোগূঢ়ৈষায় স্তরী-ভূত স্মৃতিপুঞ্জের ভাষার নির্বাধ উচ্চারণ এবং সমাজসত্তার পরম-সূক্ষ্ম উন্মোচন নাটকটির অঙ্ক-গর্ভাঙ্কে সুবিন্যস্ত হয়ে ভারসাম্যময় এক শিল্প-সৌকর্য সৃষ্টিতে নিগূঢ় ভূমিকা পালন করেছে। বিষয়-সৌন্দর্য এবং রীতিবিন্যাসের এই অভিনবত্বের জন্য প্রথমাবধি এই কালোত্তীর্ণ শিল্পকর্মকে নাটক বলতে সমালোচকবৃন্দ কুন্ঠিত হয়েছেন। আত্মযন্ত্রণাক্ষুব্ধ আত্মহননধর্মী কৌতুকরসের আড়াল থাকায় নাটকটির ট্রাজিক-গুণ অনেকের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে। আপাতঃ প্রহসনধর্মে বিভ্রান্ত হয়েই প্রথমে অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে 'সধবার একাদশী'কে 'প্রহসন' বলে শ্রেণীবদ্ধ করেও নাটকটির অন্তর্ধর্মে প্রলুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেন, "মনে হয় দীনবন্ধু কমেডির মধ্যে নিতান্ত করুণ ট্রাজিক চরিত্র আঁকিয়াছেন।"[৫৫] পরবর্তীকালে তিনি এতদ্বিষয়ে আরো অগ্রসর হয়ে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পুনর্মূল্যায়ন করেন— "'সধবার একাদশী' সাময়িক চিত্রকে অবলম্বন করে

চিরন্তন চরিত্রের রূপদানে পরিণতি লাভ করেছে। নিমচাঁদ চরিত্রে কমেডি ও ট্রাজেডি যেন মিলেমিশে আছে। তার কথা ও আচরণে কমেডির উপাদান। কিন্তু তার নিভৃত আত্মানুভূতি এবং আত্মগ্লানি-পূর্ণ স্বগতোক্তিতে ট্রাজেডির উপকরণ বর্তমান।"[৫৬] এ সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ: নাট্য-কাঠামোর উপরিতলের উপাদান-উপকরণ দৃষ্টে তার অন্তর-ধর্ম বিস্মৃত হয়ে তাকে প্রহসন কিংবা কমেডি আখ্যা দিতে হবে, এ নিয়ম সাহিত্য-বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, বহিরাঙ্গিক কথা ও আচরণে কখনো ব্যক্তির অন্তর-ধর্মের রক্তক্ষরণকে অস্বীকার করা যায় না, বরং ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্গত অনুভব, তার অস্তিত্বের কাঠামো এবং বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি যখন বিপন্ন ও অনিকেত হয়ে পড়ে তখন প্রাহসনিক উপাদান-মূল্যে নয়, চরম মূল্যে তা ট্রাজেডি। নিমচাঁদের চরিত্রে আপাতঃ কৌতুকধর্মের অন্তরালে সেই বহুবর্ণিল বেদনাপুঞ্জই প্রধান বলে আমাদের বিশ্বাস।

পুরাণ, ইতিহাস এবং অনুবাদের অক্ষমতা, অজ্ঞতা এবং পারবশ্যতা পরিহার করে সর্বপ্রথম দীনবন্ধু মিত্রই নতুনকালের নব্য ব্যক্তিত্বের বিপন্ন অস্তিত্বের ট্রাজেডি অঙ্কন করেছেন সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। দেশকালের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরোধে কৌতুক ও ঘটনাসর্বস্বতা লক্ষ্য হতে পারেনা, বরং ব্যক্তিত্বের পরাজয়জনিত ক্ষতবিক্ষত অথচ গুহাচারী মনোবেদনার উন্মোচনই এর উদ্দেশ্য। নিমচাঁদ কোনক্রমেই প্রহসনের কৌতুক বিতরণকারী নায়ক নয়, নয় আনন্দ-পরিণামী চরিত্র, বরং যুগধর্মের শৃঙ্খলে বন্দী প্রমিথিউস। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দীনবন্ধু বন্দী-নিমচাঁদের ট্রাজেডি নির্মাণে প্রথাবদ্ধ নন, নন সংজ্ঞানু-সারী, বরং নব্য-দিগন্ত সন্ধানী। স্রষ্টার দেশকালসম্ভূত প্রজ্ঞাদৃষ্টি, জীবনদৃষ্টি এবং সৃষ্টিক্ষম প্রতিভান শক্তির যোগফলে 'সধবার একাদশী' নির্মিত বলে এর রূপ ও রীতি পুনর্জাত হয়েছে। সুতরাং নিমচাঁদের চরিত্র 'হাস্য ও ট্রাজেডির দুই রাজ্য' এবং তারা 'প্রতি-বেশী'[৫৭] —এই সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে, হাসি ও কান্নার নিগূঢ় অন্তর্বয়নে ট্রাজেডিই এই নাটকের মুখ্য প্রতিপাদ্য। নাটকটির চরিত্র, চরিত্রায়ণ ও শিল্পরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে।

তিন

ক. 'সধবার একাদশী'র কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু উনিশ শতকের জটিলতর সমাজ ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে বিত্তহীন বিদ্বৎসমাজের চারিত্রিক অস্থিরতা, পরাজয়চিন্তা, নিরর্থক অহঙ্কার, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং অন্তর্গত রক্তপাত। একটি ঐতিহাসিক যুগসন্ধির বেদনাদীর্ণ-মনোভাব সমকালীন সময়-উদ্ভূত একক-ব্যক্তির প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে উপস্থাপন করার শিল্প-কৌশল গ্রহণ করায় নাটকটি প্রথাবদ্ধ ঘটনা-আশ্রয়ী না হয়ে নিগূঢ়ার্থে হয়েছে চরিত্রব্যঞ্জক। এর ফলে এ্যারিস্টটলের আদি-মধ্য-অন্ত, স্থানকাল-ক্রিয়ায় ত্রিমাত্রিক রীতি কিংবা করুণা ও ভীতি উৎপাদক ক্যাথারসিস সৃষ্টির পদ্ধতি থেকে এর বৃত্তনির্মাণ কৌশল হয়েছে ব্যতিক্রম-ধর্মী। ঘটনাভিজ্ঞান এবং চরিত্রকে অখণ্ড চেতনাপুঞ্জের আধারে ধারণ করে একক সামাজিক ব্যক্তির আত্ম-উন্মোচন, আত্ম-হনন এবং আত্ম-আবিষ্কারের বেদনাময় অস্তিত্ব-প্রবাহকে কার্যাত্মকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথাবদ্ধ বৃত্ত-নির্ভর চরিত্র, চরিত্র-অন্তর্গত বৃত্ত, মোহময় দৃশ্যপট এবং চমকপ্রদ ঘটনাবৃত্তে নাটকীয়তা সৃষ্টির পরিবর্তে সুতীব্র সংলাপ, মননসিদ্ধ বাক্য এবং নিপুণ বাক্-বৈদগ্ধ্যের মাধ্যমে বিষয়-বস্তুকে চরিত্রময় করা হয়েছে। এ-কারণে খণ্ডচিত্র, খণ্ডচরিত্র, বিচ্ছিন্ন আবেগ এবং বিচিত্র অনুভবপুঞ্জের অভিযোজনায় কেন্দ্রীয় চরিত্রই হয়ে উঠেছে নাটকটির অখণ্ড বিষয়। এই বিষয়বস্তু উনিশ শতকের সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত আহরিত হলেও শৈল্পিক অনুকরণের রীতি পঞ্চাঙ্কপ্রথায় গতানুগতিক হয়নি। কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিব্যঞ্জনায় সময়স্রোত ও সমাজ-জটিলতাকে জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল করা হয়েছে। সুতরাং এককভাবে নিমচাঁদের জীবনদৃষ্টি, জীবনাকাঙ্ক্ষা এবং বেদনাপুঞ্জের স্বরূপ-উন্মোচনে নাটকটির বক্তব্য-বিষয় ও শিল্পরূপের সন্ধান পাওয়া যাবে।

'সধবার একাদশী'র কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নামাকরণেই 'নিমচাঁদ' চরিত্রের আর্থ-সামাজিক পটভূমি আভাসিত। দীনবন্ধুর পূর্বতন নাট্য-কর্মেও এই জাতীয় সৃষ্টি-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। তাঁর প্রতিটি নাটকের প্রতিটি চরিত্রের নামাকরণে নাটকে চরিত্রটির মৌলিক ভূমিকা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে নব্যনারীচিন্তার বিকাশোন্মুখ মাদকতা ও সৌগন্ধ্যের প্রতীকরূপে 'কামিনী', 'মালতী' ও 'মল্লিকা'; তরল স্থূলতার

প্রতীক 'জলধর' এবং নব্যপ্রণয় সম্পর্কের ও দাম্পত্য-জীবনের সাধক এবং 'কোর্টশিপের' কৃতকার্য নায়ক 'বিজয়' এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'সধবার একাদশী'তে উপর্যুক্ত রীতির আপাতঃ প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলেও, এখানে এর ব্যবহার আরো গভীর ও ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে অভিব্যঞ্জিত। কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম 'নিমচাঁদ' নির্বাচন তার প্রমাণ। এখানে 'নিমচাঁদ' দীনবন্ধুর পূর্ববর্তী নাটকের চরিত্রের মতো কোন ব্যক্তিক পরিচয়ে চিহ্নিত নয়, জাতীয় বিপর্যয়ের কলঙ্কে সে প্রতীকায়িত। রাহুগ্রস্ত-চন্দ্রের উপমান-সত্য নাট্যকার নিমচাঁদ চরিত্রে সন্ধান করেছেন। চন্দ্রিকার আকর্ষণ এবং নিমফলের তিক্ততার বিকর্ষণ যেন দেশকালের গর্ভজাত দ্বন্দ্বময় বিপন্নতার রূপক। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত হৃদয়, ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধে 'নবজাগ্রত' চেতনা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের শক্তি ও সম্ভাবনায় উজ্জীবিত মধ্যবিত্ত মানবভাগ্য ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে এবং কলোনীর অশক্ত ব্যক্তির অন্তর্বিরোধে বিনষ্ট, ক্ষতবিক্ষত এবং পরাজিত হয়। জাতীয় জীবনের এই সামগ্রিক পরাভবকে দীনবন্ধু মিত্র 'নিমচাঁদ' শব্দ-প্রতীকে ধারণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং নিমচাঁদ কোন ব্যক্তিমাত্র নয়, তাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে যুগ-চিহ্নিত অন্যান্য চরিত্র। খণ্ডচিত্র হিসেবে 'সধবার একাদশী'র এইসব চরিত্র যুগপ্রকাশক, কিন্তু নিমচাঁদের চরিত্রস্বরূপকে সক্রিয় ও জীবন্ত করে তুলতে তারা নাটকীয় ভূমিকায় হয়েছে উদ্দীপক। নিমচাঁদের প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে এদের টাইপধর্ম যেমন উজ্জ্বল হয়েছে, তেমনি এদের সম্মিলিত উপস্থিতিতে নিমচাঁদ-চরিত্রই হয়েছে স্ফটিকায়িত। এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

সময় ও সমাজ পরিপ্রেক্ষিতের নির্দিষ্ট বলয়ে নিমচাঁদকে স্থাপন করা হয়েছে বলে 'সময়ের' আভ্যন্তর-দ্বন্দ্বে তার চরিত্র-সত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পট-বিধৃত মানুষের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব এবং নিজের অর্ন্তসত্তার সঙ্গে তার বিরোধ----এই দুই বিরোধকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে দীনবন্ধু এই নাটকে আরো দু'ধরনের মানুষ নির্বাচন করেছেন। একদিকে নব্য ও প্রাচীন উভয় দলের সমাজপতিবৃন্দ, অন্যদিকে নব্য ও সনাতন-পন্থীদের মিশ্র বাবুসংস্কৃতির প্রতিনিধিবর্গ। এর মধ্যে নিমচাঁদ সর্বাংশে একা এবং নিঃসঙ্গ। জীবনচন্দ্র সনাতনপন্থী ধনবান ব্যক্তি, তার পুত্র অর্ধশিক্ষিত অটলবিহারী। ধনবান পিতা ও

পুত্রকে কেন্দ্র করে নাটকে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি খাড়া করা হয়েছে— ১. অটলবিহারী, ইয়ার ভোলা, রামমাণিক্য, ভৃত্য দামা প্রমুখ বাবুসংস্কৃতির সেবক, ২. জীবনচন্দ্র, অটলের খুড়শ্বশুর গোকুলচন্দ্র, ডেপুটি কেনারাম, রামধন রায় এবং বৈদিক প্রমুখ সামাজিক সুস্থতার তথাকথিত প্রবক্তা। উনিশ শতকের সামগ্রিক নৈতিক অসংগতিকে বাস্তবসম্মত করার জন্য দীনবন্ধু উপর্যুক্ত দুই শ্রেণীর চরিত্রের অন্তর্বিরোধও চিত্রিত করেছেন। কেনারাম ডেপুটি এই স্ববিরোধিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কখনো কখনো গোকুলচন্দ্র এবং নকুলেশ্বরও তাই। পরস্পর দুই পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে তেমন কোন নাটকীয় অন্তর্সংঘাতের সৃষ্টি হয়নি। এই নাটকের যে মৌলিক সংঘাত তা নিমচাঁদের নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব এবং বিপন্ন চেতনার সঙ্গে সময়ের দ্বন্দ্ব। অধঃপতিত এবং মূর্খ একটি সমাজপরিবেশে সৃষ্টির জন্য দীনবন্ধু উপর্যুক্ত চরিত্রসমূহের সামগ্রিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ক্রীতদাস এবং শিক্ষাদীক্ষায় অকাট মূর্খ ডেপুটির নাম তাই 'কেনারাম' এবং তার চাকুরিস্থান 'নিপাতগঞ্জ'; নীতিহীন রতিসম্ভোগ, বারনারীর সঙ্গ-সুখ-প্রিয় 'বাবু' এবং অস্থিরচিত্ত 'আলাল' 'অটলবিহারী'; কাঞ্চনমূল্যে কেনা বারবিলাসিনী 'কাঞ্চন' ---এই নাম, নামাকরণ ও তাদের চিত্ত-সংকটের মধ্যে সময়ের দ্বন্দ্ব প্রতিধ্বনিত। এই বিপন্ন সময় ও সমাজ-পরিবেশে স্থাপন করে দীনবন্ধু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিমচাঁদের স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, সুস্থজীবন অভীপ্সা এবং এর ব্যর্থতাজাত ক্রন্দনকে রূপময় ও চিত্রময় করে তুলেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিত্ত-ব্যর্থতা এবং চিত্ত-ব্যর্থতা নিমচাঁদের আত্মসংকটের কেন্দ্রবিন্দু। শিক্ষাদীক্ষায়, মেধামননে এবং হৃদয়ধর্মে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকের মধ্য-পর্যায়ে ঔপনিবেশিক প্রশাসনে, বিত্তবান অভিজাত শ্রেণীর সমাজকেন্দ্রে এবং প্রণয়ধর্ম ও দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। বিত্তবান কেনারামরা তাদবিরের জোরে, ধনবান অটলেরা বিত্তের পণ্যমূল্যে ব্যক্তিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক শক্তি সঞ্চয় করে। বিত্তের জোরে গোকুলচন্দ্র জয় করে নেয় আধুনিক দাম্পত্য ও পারিবারিক সুখ। কিন্তু নিমচাঁদ যোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও, বিত্তহীন বলে পরাশ্রয়ী, পরাজিত এবং বঞ্চিত। এই ব্যর্থতা এবং পরাজয় থেকে তার জীবনের সুস্থভিত্তিভূমি

ধসে পড়েছে। 'সধবার একাদশী'র নানা দৃশ্যে দীনবন্ধু নিমচাঁদের ব্যর্থজীবনের প্রতিশোধ কামনা, আত্মধিক্কার এবং সুস্থতার জন্য তার গুহায়িত কামনার রূপব্যঞ্জনা অঙ্কন করেছেন। যে অটল এবং তার জীবনযাপন-প্রণালীকে নিমচাঁদ ঘৃণা করে, তার সঙ্গ গ্রহণ করেই নিমচাঁদ আত্মবিনাশের পথ বেছে নেয়। এই নির্বাচনে সে অত্যন্ত আত্ম-সচেতন, এ-কারণে তার অধঃপতন এবং আত্ম-উন্মোচন বেদনার্ত।

অবৈধ উপায়ে অর্জিত বিত্তবান জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলবিহারী অপচিত আভিজাত্য, অন্ধতা ও অপসংস্কৃতির প্রতিনিধি। সনাতন গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তুভিটাশ্রয়ী সুস্থ সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন এবং নব্যজীবন ধারণাপ্রসূত যুক্তিনিষ্ঠ প্রণয়-সম্পর্ক 'অটল' চরিত্রে সং-শ্লেষিত না হয়ে বরং কালবহ্নিতে সে ক্ষতবিক্ষত, অবক্ষয়-চিহ্নিত এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিমচাঁদ তার বিত্তহীন জীবনের পরা-জয়ের ব্যর্থতার প্রতিশোধ গ্রহণ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 'মাতাল যাত্রা-নিৰ্ব্বাহ'[৫৮] করার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্যে অটলের অধঃপতনকে আরো ত্বরান্বিত করে। যোগ্য নিমচাঁদ অর্থাভাবে নিঃস্ব কিন্তু বিত্তের জোরে 'হস্তিমূর্খ অটল ছাগলের'[৫৯] বিয়ে হয় সুন্দরী নারীর সঙ্গে ; বিষয়বুদ্ধি ও 'সুকতলার'[৬০] জোরে অর্ধশিক্ষিত কেনারাম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়, বিত্তের শক্তিতেই ভণ্ডব্রাহ্ম গোকুলচন্দ্র 'খুব লেখাপড়া জানা' এবং কোমরের অ্যালবার্টচেনে ঘড়ি বাঁধা নব্যনারীর স্বামী হওয়ার যোগ্যতা ছিনিয়ে নেয়। উনিশ শতকে কলকাতার লোক-সমাজ 'গুণ দেখে না, কেবল বিষয় খোঁজে'[৬১] বলেই বিত্তহীন নিমচাঁদ রাজনৈতিক মঞ্চ, সামাজিক বৈঠকখানা এবং কর্মজীবনে নির্বাসিত, বিতাড়িত, বিচ্ছিন্ন এবং নিষ্কর্ম। সময় ও সমাজ কর্তৃক প্রহৃত হয়ে তার মর্মকোষে সঞ্চিত হয় অগ্নিগিরির মতো প্রতিশোধ-স্পৃহার লাভা। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ও ব্যক্তিত্বে অশক্ত মধ্যবিত্ত-মানসের এই প্রতি-শোধ কামনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমীকৃত না হতে পেরে 'বাবুসংস্কৃতি' বিনষ্ট বহ্ন্যুৎসব এবং মদ্যপানের আড্ডায় আত্মবিনাশে মুখ থুবড়ে পড়ে। নিমচাঁদ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যথার্থ প্রতিনিধি রূপে অটলকে আশ্রয় করেছে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। নিমচাঁদ তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন—"ওর বাপ অনেকের সৰ্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকৰ্ম্মে ব্যয় হক্।"[৬২] যে আর্থ-সামাজিক শোষণ

ও বৈষম্য প্রক্রিয়ায় দরিদ্র-সন্তান নিমচাঁদ সমস্ত যোগ্যতা সত্ত্বেও আত্ম-প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ---সেই শোষণ ও বৈষম্যের উপর গড়ে ওঠা অটলের বিত্ত ও সামাজিক অবস্থানকে বিধ্বস্ত করাই তার লক্ষ্য। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অটলকে মদ ধরিয়ে তাকে নিজের 'আস্তাবলের বাঁদর'[৬৩] করে স্বীয় আত্মনিমজ্জনের সুব্যবস্থা করা। প্রকৃতপক্ষে নিজের ব্যর্থতার যন্ত্রণাকে নেশার নির্বেদে গলা টিপে হত্যা করাই তার মৌল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনে নিমচাঁদ সার্থক হলেও, জাগ্রত বিবেক এবং জীবন সম্পর্কে তার সুস্থ কামনাকে সে হত্যা করতে পারেনি; নেশার ফাঁকে কিম্বা অবচেতনে সে ব্যক্ত করেছে তার ব্যর্থতার করুণ কাহিনী। এ কারণে নিমচাঁদ প্রতিহিংসা-পরায়ণ এবং নির্মম জন্তু-রূপে চিহ্নিত না হয়ে, মানবিক হয়ে উঠেছে। তার এই মানবসত্তা, পরিবেশ ও পরিচিত-মণ্ডলের সঙ্গে তার আত্মদ্বন্দ্বে সুপ্রকাশিত। জীবনে যাকে ঘৃণা করেছে, জীবনধারণের জন্যে তাকেই সে সঙ্গীরূপে নির্বাচন করেছে; চিত্তলোকে যে নারীর রসমূর্তি সে ধ্যান করেছে, বাস্তব-জীবনে তাকে সে পায়নি। প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির এই দ্বন্দ্বেই নিমচাঁদের মানবিকসত্তা ও তার অন্তর্গত ট্রাজেডি উন্মোচিত হয়েছে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির ভাবমানসে 'নবজাগরণের' যে অন্তরাবেগ সৃষ্টি হয়, পরাশ্রিত বলে নিমচাঁদের চরিত্রে তার বিনাশী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে সে কাম্য মানব-জীবন, আকাঙ্ক্ষিত সমাজবৃত্ত এবং প্রতিষ্ঠিত নীতিবোধকে রুদ্রের মতো ত্রিশূল-তীক্ষ্ণ সমালোচনায় আক্রমণ করেছে। এর ফলে সন্ধিযুগের একটি জাতির ও তার অবক্ষয়িত সমাজের নগ্ন-পরিচয় উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। যুগ-যন্ত্রণার পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তি ও অস্থিরতা, স্বপ্ন ও আশার বিভ্রান্ত জীবনবেদ নিমচাঁদের আচার-উচ্চারণে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই পতন যে স্বয়ম্ভূ নয়, বরং যুগেরই প্রতিচ্ছবি, তার প্রমাণ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমিত শক্তির ট্রাজিক অবসান, তাঁর সৃষ্ট রাবণের জীবনের ব্যর্থতা এবং স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধুর নিষ্ঠুর পদাবনতি এবং অহিফেন-সেবনে মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলে থাকার নেশা-নির্বেদ কামনার মধ্যে আভাসিত। নিমচাঁদও পরাজিত জীবনে বীতস্বপ্নের মর্মজ্বালা ও অচরিতার্থতার বেদনাবহ্নির নির্বাণ চেয়ে বিনষ্ট চীৎকারে মদিরার আত্মঘাতী নেশায় ও কলোনীর পাপচক্রে আত্মগোপন করতে

চেয়েছে। অথচ এই জীবন তার প্রত্যাশিত ছিল না। তাই সে আত্মধিক্কার করে বলেছে, "রে নিমচাঁদ, তুমি একবার নয়ন নিমীলন করে ভাব দেখি, তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ। তুমি স্কুল থেকে বেরুলে এক দেবতা, এখন হয়েছ একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।"[৬৪] জীবনের কলুষতা সম্পর্কে অটল নির্দ্বন্দ্ব, কিন্তু জীবনধারণার সুস্থ ও মহিমাময় স্বর্গচ্যুত বলে আত্মদ্বন্দ্বে ও বিচ্ছিন্নতাবোধে নিমচাঁদ রক্তাক্ত। অটলের চরিত্র মূলতঃ উদ্বৃত্তবিত্ত এবং বিনষ্ট সময়ের দাসত্বে শৃঙ্খলিত। নিমচাঁদের জীবন অটলের হাত ধরে "নিম্নমুখী সিঁড়ি ধরে নরক নিমজ্জনের"[৬৫] ইতিবৃত্তে বাঁধা। কলোনীর 'পাপদত্ত বিত্ত'[৬৬] ধনী পিতার স্নেহের শাসন, অন্তর্বিরোধে দুর্বল ব্রাহ্ম গোকুলচন্দ্রের উপদেশ এবং অবরোধবাসিনী স্ত্রী কুমুদিনীর নিষ্ক্রিয় আকর্ষণ অটলকে ধরে রাখতে পারেনি। নীতিহীন সমাজ ও বৈরী সময়ের টানে সে অনিবার্যভাবে মদ্যপান, বেশ্যা প্রতিপালন এবং ইয়ার বন্ধুদের পানাহারে মত্ত হয়ে উঠেছে। হেয়ার সাহেবের স্কুলে 'Baboos Class'[৬৭] অধ্যয়ন করে সে গর্বিত। কিন্তু শেক্সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'কে সে 'Merchant of Venerial'[৬৮] বলে। এই মূর্খ অটলকে কোনক্রমেই নিমচাঁদ পছন্দ করে না। সে অটলকে "রমা নাথের এঁড়ে"[৬৯] বলে ব্যঙ্গ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও, বিত্তের জোরে নিমচাঁদের চেয়ে সামাজিকভাবে অটল প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী কুমুদিনী এই অপদার্থ, অশিক্ষিত এবং মাতাল স্বামীর অত্যাচার ও উপেক্ষায় বৈধব্যতুল্য যন্ত্রণায় ক্লান্ত। অন্যদিকে অটল শাশুড়ী-সম্পর্কীয়া গোকুলচন্দ্রের স্ত্রী অনঙ্গসুন্দরীকে অপহরণের ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত। নিমচাঁদ অর্থ, ধর্ম ও পুণ্য বিনাশকারী এবং 'নব্যবঙ্গ বৃন্দ ধ্বংসকারিণী', 'পাপদত্ত বিত্তমত্ত রঙ্গিণী'[৭০] বারবিলাসীনীর সঙ্গে অটলের সম্পর্ককে উজ্জীবিত করলেও, অনঙ্গরঙ্গিনীর প্রতি অটলের আসক্তিকে অনুমোদন করেনি। সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, "গৃহস্থের মেয়ে বারকরনের মতলব করনা বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে",[৭১] তারচেয়ে, "তোমার মেগের কাছে যাও"।[৭২]

নিমচাঁদ চরিত্রের এই বিপরীত সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, নাট্যকার অনঙ্গরঙ্গিনীর মাধ্যমে তার চরিত্রের ভিন্নতর একটি গ্রন্থিকে উন্মোচন করেছেন। নিমচাঁদ তার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতার জন্য গোকুলচন্দ্রের স্ত্রী অনঙ্গরঙ্গিনীর প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব

করেছে। ক্লিওপেট্রার নগ্নসৌন্দর্য ও মানবী-সত্তার অবাধ উন্মোচনের সঙ্গে রেনেসাঁস-উত্তর মুক্ত নারীর প্রণয়-সম্পর্ক ও দাম্পত্য জীবনের পরমসূক্ষ্ম অন্তর্বয়ন সংশ্লেষিত যেন 'খুব লেখাপড়া জানা' 'অ্যালবার্ট চেনধারিণী'[৭৩] ও ঘড়ি পরিহিতা অনঙ্গরঙ্গিনীর মধ্যে। নিমচাঁদের কাছে এই আধুনিক সংস্কৃতিবান নারীর মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। শিক্ষিত নিমচাঁদের কাছে এই নারীই ছিল জীবনসঙ্গিনী রূপে একান্ত কাম্য। যে নারী সর্বাংশে নর্মসহচারী নয়, বরং ঘরে-বাইরের মর্মসঙ্গিনী ও কর্মপ্রেরণাদাত্রী; স্বপ্নলালিত এবং পাশ্চাত্যসভ্যতা-উদ্ভূত—সেই নারী নিমচাঁদের ভাগ্যে জোটেনি। এমন নারীর জীবনসঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি সে-ই---যার মধ্যে বিদ্যা ও বিত্তের মণিকাঞ্চন যোগ সম্ভব হয়েছে। নিমচাঁদের দৃষ্টিকোণে অনঙ্গরঙ্গিনীর জীবনও ব্যর্থ। কারণ গোকুলচন্দ্র 'মর্কট' বিশেষ। বিদ্যায় অন্ত্যজ হয়েও বিত্তকৌলীন্যে সে অনঙ্গরঙ্গিনীকে জবরদখল করেছে। তার ধারণা নিম্নোক্ত ভাষায় সে ব্যক্ত করেছে, "···এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট ম্যান ইন্ দি রাইট প্লেস হতো।"[৭৪] কিন্তু অনঙ্গরঙ্গিনীর কোমরে বাঁধা 'সময়ের'-ঘড়ির উপমান চিত্রে নিমচাঁদের ভাগ্যে কেন এই রত্ন জোটেনি তার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। বিত্ত-শাসিত সময় ও সমাজে সে "অতিদীন, সহায় সম্পত্তিহীন"[৭৫] বলে সামন্তসমাজ-লালিত অন্য এক অবরোধ-বাসিনীকে বিবাহ করে শ্যালকের গৃহে আশ্রয়-প্রাপ্ত হয়েছে। জীবন-ধারণের জন্য জীবনধারণাকে বিসর্জন দিয়ে 'অটলের টেবিলে, নকুলের বাগানে হরিণামৃত পান করে মাতাল যাত্রানির্ব্বাহ'[৭৬] করার মতো হীন জীবনকে আলিঙ্গন করতে হয়েছে। দাম্পত্য-জীবনের এই ব্যর্থতার যন্ত্রণা নিমচাঁদ মদের বোতলে মুখ রেখে উচ্চারণ করেছে, "বলতে কি, বড়রাণীর অধর চুম্বন করে থুথু খেয়ে মরিচি, লোক লজ্জার ভয়ে মাগীর তামাক-পোড়া-মাখা থুথুগুলোকে সুধা বলিচি, কিন্তু ছোট রাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত, যেন এখনি সাগর হতে উঠলো।"[৭৭] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কাম্য নারীর সঙ্গ বঞ্চিত হয়ে যে দাম্পত্য জীবনকে সে গ্রহণ করেছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। ফলে 'বোতল সুন্দরীকে'[৭৮] নব্যনারীর সহবাস বলে আত্ম-উন্মোচনে আবেগতাড়িত হয়ে উঠেছে। মাতাল অবস্থায় 'বোতল সুন্দরী' ও 'ক্লিওপেট্রার' ছবির প্রতি তার অবদমিত মনোকূটৈষা অভিব্যক্ত হলেও, সুস্থ অবস্থায় সে অনঙ্গরঙ্গিনীর শিক্ষা, রুচি এবং সৌন্দর্যের প্রতি মানবিক আকর্ষণ বোধ করে।

এ-কারণেই মূর্খ অটলের সঙ্গে অনঙ্গরঙ্গিনীর কোন প্রকারের সম্পর্ককে সে অনুমোদন করেনি। নিমচাঁদ অধঃপতিত জীবনে অটলের সঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও এইভাবে পৃথক সত্তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্তর্গত বেদনার বারং বার উন্মোচনে সে ব্যক্তিত্বময় ও মানবিক হয়ে উঠেছে। পাপ-পঙ্কে অধিবাস করেও, পাপকে সে ঘৃণা করেছে। সে জানে যারা সুনীতি, সমাজাদর্শ এবং সভ্যতার বড়াই করে তারাও ব্যক্তিক আচরণ ও উচ্চারণে বিশ্বস্ত নয়। 'সুরাপান নিবারণী সভা'র নামে গোকুলচন্দ্রের মদ্যপান বিরোধী ভূমিকা ও ব্রাহ্ম-আদর্শ প্রচারকে সে যেমন 'hypocrisy' বিবেচনা করে, তেমনি কেনারাম ডেপুটির সমাজনীতি প্রচারকে ভণ্ডামী বলে মনে করে। অটলের বেশ্যার প্রতি প্রণয়ানুরাগ, কাঞ্চনের 'সতীত্ব' ধর্ম, বারবিলাসিনী দ্বয়ের 'খাতায় নাম লেখানো' এবং গোকুল-চন্দ্রের ও জীবনচন্দ্রের সুরাপান নিবারণী সভায় 'নাম লেখানো'কে বস্তুতঃ বৃহত্তর পটভূমিতে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাচার এবং আত্মপ্রতারণা বলে গণ্য করেছে। কারণ, জীবনচন্দ্রের অর্জিত বিত্ত, গোকুলচন্দ্রের সাম্প্রতিক সামাজিক অবস্থান, কেনারামের সরকারি পদলাভের পূর্ব-ইতিহাসও নীতিহীন স্বার্থপরতা, মোসাহেবী, নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ এবং অশ্লীল পাপাচারে মলিন। সুতরাং অটলের অধঃপতন, কাঞ্চনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং নির্লজ্জতাকে সময় ও সমাজের স্বাভাবিক উত্তরাধিকার বিবেচনা করা ছাড়া বাস্তব-সতর্ক নিমচাঁদের গত্যন্তর ছিল না। এ-কারণে অটল যখন গোকুলচন্দ্রের স্ত্রী অনঙ্গরঙ্গিনীকে বের করে আনতে গিয়ে নিজ স্ত্রী কুমুদিনীকে বের করে বৈঠকখানায় নিয়ে আসে, তখন রামবাবুর প্রহারের জবাবে নিমচাঁদ সেই কালের অসঙ্গতি ও তার অন্তর্গত অবক্ষয়ের চরম সত্যটি প্রকাশ করে। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্নীতি, অরাজকতা এবং উৎকেন্দ্রিক-অশ্লীলতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কেউ দায়ী নয়। এ-জন্য দায়ী "সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।"[৭৯] জীবনচন্দ্র, গোকুল-চন্দ্র, কেনারাম, অটল প্রমুখের বিত্ত আছে, সভ্যতাভিমান আছে, কিন্তু বিদ্যার যে প্রাচুর্য নেই, তা অনস্বীকার্য। নিমচাঁদের আছে সেই প্রার্থিত বিদ্যা, কিন্তু বিত্ত নেই। সুতরাং 'সময়' কথাটি নিমচাঁদ এবং অটল উভয়ের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। অটলের মূর্খতা, অশ্লীলতা এবং নিমচাঁদের আত্মক্ষয় ও আত্মবিনাশ একই সময়-সূত্রে বাঁধা। উনিশ শতকের "Bloody bowdy villain. Remorsless treacherous, Lecherous, Kindless

villain."[৮০]—শাসন-শোষণে জীবন যেন একটি বিধ্বস্তবন্দর; নিমচাঁদের উপমান চিত্রে 'Port in a storm'[৮১], সময়ের এই দুরন্ত ঝড়ে নিমচাঁদ অটলকে ঘৃণা করেছে, আঘাত করেছে, আবার অধঃপতনের অতলে নিমজ্জিত হতে হতে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছে। এত কাছাকাছি থেকেও নিমচাঁদ কখনো অটল হতে পারেনি, হতে চায়ওনি। অটল নিজের স্ত্রীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগে বাধ্য করে, এমনকি দুরাচারের চরম সীমায় পৌঁছে কুমুদিনীকে ঘরের বাইরে বের করে এনে পারিবারিক স্নিগ্ধতা কলুষিত করেও সে অনুতপ্ত হয়নি; পক্ষান্তরে বারবিলাসিনী কাঞ্চন অটলের অজ্ঞাতে নকুলেশ্বর উকিলের বাগান বাড়িতে বেড়াতে গেলে সে অপমানিত বোধ করে। অটলের ধারণা, "ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না।"[৮২] অটল বড়লোকের পুত্র, "বোকারাম অকাল কুষ্মাণ্ড,··· বেশ্যার বজ্জাতি"তে[৮৩] নেশামত্ত বলে ভালোমন্দ জ্ঞান-বর্জিত। স্ত্রীর মর্যাদা সম্পর্কে তাই সে উদাসীন। কিন্তু একই কলঙ্কিত বৃত্তে থেকেও নিমচাঁদ স্ত্রী সম্পর্কে ভিন্নতর বেদনায় অশ্রুময়, "আমার জন্যে প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, আমার নিন্দা শুনতে হয় বলে কারো কাছে বসেন না। ···বেশ দেখতে পাচ্চি, আমার কথা নিয়ে সকলে কানাকানি করছে, কুরঙ্গ নয়নী কার্য্যান্তর ব্যপদেশে প্রাসাদের প্রান্তভাগে বিজন স্থানে কর-কপোল হয়ে ভাবনা প্রবাহে ভাসমানা আছেন, আলুলায়িত কেশ, লুন্ঠিত অঞ্চল, অশ্রুবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার ন্যায় দুলিতেছে"।[৮৪] স্ত্রীকে সে পছন্দ করে না, সেই স্ত্রীর প্রতি তার এই সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ মূলতঃ উনিশ শতকী নারীমুক্তি-বিষয়ক চেতনা-উদ্ভূত। নব্যশিক্ষিত ব্যক্তির মুক্ত নির্বাচন, প্রণয়-সম্পর্ক ও দাম্পত্য-জীবনানন্দের স্বপ্ন-প্রতিমার বাস্তব-দৃষ্টান্তরূপে এই নারী গ্রহণযোগ্য না হলেও তার সামন্ততান্ত্রিক-অবক্ষয়িত জীবনের যন্ত্রণাকে নিমচাঁদ আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছে। এই অপক্ষপাত, নিরপেক্ষ এবং নিস্পৃহ জীবনদৃষ্টির জন্য সে অনন্য হয়ে উঠেছে। এই নিস্পৃহতা এসেছে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে সচেতন লক্ষ্যমুখিতা এবং মীমাংসিত সিদ্ধান্ত থেকে। এ-ব্যাপারে বারবিলাসিনী কাঞ্চন এবং নিমচাঁদের মধ্যে এক ধরনের সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ বোধ হয় তারা দুজনই অস্তিত্বের প্রশ্নে অসৎ পথে অর্জিত অন্যের বিত্তের অংশ-ভোগের জন্য উদ্দেশ্য-নিবেদিত। অর্থের নগদ মূল্যের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য দেহ ও রূপ-ব্যবসায়ী

কাঞ্চনের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। সে জানে যতদিন দেহ ও সৌন্দর্য-রূপ কাঁচাপণ্য মজুদ থাকবে, ততদিন তার বাজার-দর টিকে থাকবে, নতুবা সমাজ ও সংসারে সে পতিতা। সেজন্য জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ এবং অনেকাংশে নির্মম। তার প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা ও 'সতীত্ব' বিষয়ে সন্দেহ করে অটলের আত্মহত্যা-প্রয়াসে কাঞ্চন বিন্দুমাত্র আনন্দিত, আবেগায়িত ও গর্বিত হয়নি, বরং সুগভীর বাস্তবজ্ঞান থেকে ভীত হয়ে ভেবেছে, "এমন খুনের কাছে ভদ্রলোকের"[৮৫] অবস্থান করা বিপদজনক। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নিমচাঁদও মীমাংসিত বলে সে যেমন অটলের মূর্খতা, গোকুলের ভণ্ডামী, কাঞ্চনের 'বজ্জাতি' সম্পর্কে স্পষ্টভাষী, তেমনি নিজের অধঃপতন এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে সে উচ্চকণ্ঠ ও নিরপেক্ষ। এ-কারণে নিমচাঁদ অধঃপতন ও ব্যর্থতাকেও ক্ষমা করেনি—একদিকে নৈতিক অবক্ষয়ের অন্ধকার অতলতলে নিমজ্জিত হয়ে সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিয়েছে, অন্যদিকে তার চেয়ে অনেকাংশে নিকৃষ্ট, বর্ণচোর, ভণ্ড ও বজ্জাত ব্যক্তিরা যখন তাকে আঘাত করেছে, তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনন্য ভাষায় তাদের মুখোস উন্মুক্ত করেছে। তীব্র নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে প্রতিপক্ষকে, আবার নিজেও অন্তর্লোকে হয়েছে রক্তাক্ত। এই রক্তাক্ত চেতনাপুঞ্জ, বেদনাদীর্ণ আত্মক্ষরণ এবং মর্মান্তিক আত্ম-যন্ত্রণার উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় নিমচাঁদের নিম্নোক্ত সংলাপে, "হা! জগদীশ্বর! (রোদন) আমি কি অপরাধ করেছি, আমাকে অধর্ম্মাকর মদিরাহস্তে নিপাতিত কল্যে? যে পিতা চৈত্রের রৌদ্রে, জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে, শ্রাবণের বর্ষায়, পৌষের শীতে মুমূর্ষু হইয়া আমার আহার আহরণ করেছেন, সে পিতা এখন আমায় দেখলে চক্ষু মুদিত করেন; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতেন এবং মুখ চুম্বন করিতে করিতে আপনাকে ধন্যা বিবেচনা কত্তেন, সেই জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে করাঘাত করেন; যে শ্বশুর আমাকে জামাতা করে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখ্‌লে মুখ ফিরিয়ে বসেন, শাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন, ··· আমি আপনার কুচরিত্রে আপনিই কম্পিত হই"।[৮৬] নিমচাঁদের এই আত্ম-উন্মোচন, আত্মখনন ও আত্মসমীক্ষার মধ্যে তার ট্রাজেডি-সত্তা অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে এ-জাতীয় আত্মঘোষণার মাধ্যমেই তার চরিত্রের শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে। সমস্ত

পতন ও স্খলন সত্ত্বেও তার মধ্যে আমরা সমকালীন 'নবজাগরণ'-উদ্ভূত মানব-মূল্য, আত্মগরিমা ও ব্যক্তিত্ববোধ লক্ষ্য করি। এই ব্যক্তিত্ব-বোধ থেকেই কাঞ্চন সম্পর্কে সে নির্মোহ, গোকুলচন্দ্রের স্ত্রীকে বের করে আনবার ব্যাপারে সে বিরুদ্ধবাদী, নিজের স্ত্রীর অসম্মানের জীবন সম্পর্কে বেদনার্ত। এই ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্ম-সম্মানচিন্তার জন্য নিমচাঁদ চরিত্রে সংযোজিত হয়েছে নতুনতর মাত্রা। তার অর্জিত বিদ্যা সামাজিক শক্তি অর্জন করতে পারেনি সত্য কিন্তু বিদ্যার মাহাত্ম্য এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তার মনে কখনো বিন্দুমাত্র সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি। সে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তার বিদ্যা, সম্মান এবং ব্যক্তিত্ববোধকে তার অধঃপতন, দারিদ্র্য এবং আত্মক্ষয় থেকে পৃথক করে বিবেচনা করেছে। কারণ বিদ্যা ও ব্যক্তিত্ববোধ সে নিজে অর্জন করেছে---কিন্তু বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং অধঃপতনের জন্য সে দায়ী নয়। যার জন্য সে নিজে দায়ী নয়, তার দায়ভার সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। তাই বিদ্যায় ও ব্যক্তিত্বে সে যে শ্রেষ্ঠ---এতদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিরূপ মন্তব্য সে শুনতে প্রস্তুত নয়। কেনারাম ডেপুটি এ-জাতীয় ইঙ্গিত করায় নিমচাঁদ তীব্রভাষায় তাকে আক্রমণ করে, "বাবা সুকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটি হয়েছ, বিদ্যার জোরে হওনি---তোমার কালেজের একটাকেও দেখাও দেখি আমার মতো ইংরিজি জানে---I read English, Write English, talk English, Speechify English, think in English, dream in English."[৮৭] পাশ্চাত্য-বিদ্যা, ধনতান্ত্রিক সভ্যতা-উদ্ভূত প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-চিন্তা এবং রেনেসাঁস-উত্তর মানবিক চেতনা সমন্বয়ে তার মধ্যে সংস্থিত হয় এক অপরাজেয় শক্তি। এ-কারণে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ক্রীতদাস কেনারাম তার কাছে তুচ্ছ ব্যক্তি; জীবনচন্দ্র, রামচন্দ্র, গোকুল গুরুত্বহীন; অটল মূর্খ, কাঞ্চন 'বজ্জাত'। কেনারামের সম্মুখে নিজের বুকে চড় মেরে নিমচাঁদ যখন বলে, "কি spirit, এরে বলি moral courage এমন মর‍্যাল কারেজের ছেলে আমি, আমি তোমাকে পাজি বল্‌বো তার আবার কথা? "দত্ত কারো ভৃত্য নয়"---These words should be written in letters of gold."[৮৮]—তখন তার উক্তি কেবলমাত্র বাকবিভূতি মনে করা যায় না। এই অসীম শক্তি ও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন সময় ও সমাজ-শৃঙ্খলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মক্ষয়ের পথ বেছে নেয়। শতাব্দীর জীর্ণ আর্থ-সামাজিক ধ্বংস-স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বিত্ত, মেধা ও মর‍্যাল কারেজ সবকিছুর

অন্তঃসারশূন্যতায় স্বয়ং স্তম্ভিত হয়ে বিস্ময়ে মদের নেশার নির্বেদ কামনা করেছে। স্বেচ্ছানির্বাসিত অবচেতনার বিবর থেকে মুখ বের করে কখনো বৈরী সময়কে আঘাত করেছে এবং কখনো নিজের আক্রমণে নিজেই হয়েছে রক্তাক্ত।

নিমচাঁদ চরিত্রের এই রক্তাক্ত-বিবেক, সত্যানুসন্ধানী-আত্মখনন এবং নিরপেক্ষ আত্ম-উন্মোচনের পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ না করা সত্ত্বেও তার চরিত্রের ব্যর্থতা এবং "উন্নতি কামনা বিফল"[৮৯] হওয়া বিষয়ে সর্বপ্রথম বক্তব্য প্রকাশ করেন ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য। বঙ্কিমচন্দ্র এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষও ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের প্রতিধ্বনি করেন মাত্র। ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, নিমচাঁদের আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের পক্ষে "দুর্নিবার মদ্য-পিপাসাই বাধা।"[৯০] পরবর্তী অধিকাংশ সমালোচক প্রকারান্তরে এই মতেরই পরিপোষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, ব্যর্থতার জন্য মদ্যপান, না মদ্যপানের জন্য ব্যর্থতা---এ জাতীয় বিবেচনা খণ্ডিত হতে বাধ্য। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নিমচাঁদের ব্যর্থতা, অধঃপতন এবং মদ্যপান সবকিছুর জন্য দায়ী সময়। একদিকে বর্ণবাদী ঔপনিবেশিক প্রশাসনের বৈরী আচরণ, অন্যদিকে বিত্ত-কৌলীন্যের নব্য সমাজশক্তি অর্জন--এই দুয়ে মিলে জাতীয় জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, অপাপবিদ্ধ নিমচাঁদ কালের সেই পাপ-পঙ্কে পতিত হয়েছে মাত্র। আর্থ-সামাজিক দিকটি বিবেচনায় না নিয়ে কেবলমাত্র বহিরাঙ্গিক সাযুজ্য লক্ষ্য করে লোকেন্দ্রনাথ পালিত বিশ্বসাহিত্যের অমর চরিত্র গ্যেটের (১৭৪৯--১৮৩২) ফাউস্ট-এর সঙ্গে নিমচাঁদের তুলনা করেছেন।[৯১] বিফলীকৃত শিক্ষার "প্রশ্নে নিমচাঁদের তুলনা 'ফাউস্টের' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও, লোকেন্দ্রনাথ পালিতের "মেফিসটোফেলিস অশরীরী হইয়া মদের বোতলে"[৯২] প্রবেশ করেছে অর্থাৎ মদরূপ-শয়তানের প্ররোচনায় কলকাতার ফাউস্ট নিমচাঁদ-এর জীবন ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে—এ-সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সত্য নয়। তাছাড়া যে ধর্মীয় সুনীতি ও সংযমবোধ শেষপর্যন্ত ফাউস্টকে নরকাগ্নি থেকে উদ্ধার করেছিল, ঔপনিবেশিক প্রশাসন-এর শাসন-শোষণ প্রক্রিয়া এবং সামাজিক মুদ্রাচেতনার মূর্খ দাপটের কাছে সেই সুনীতি অর্থহীন। 'নীলদর্পণ' নাটকের ক্ষেত্রমণি-উদ্ধার দৃশ্যে নায়ক নবীনমাধব ও ইংরেজ নীলকরের কাছে খ্রীস্টধর্মের সুনীতি ও

জীতেন্দ্রিয়তা প্রত্যাশা করে কি পরিণতি লাভ করেছিল তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সুতরাং 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ চরিত্র-ধ্যানের সময় নাট্যকার নিঃসন্দেহে সুনীতি-বিষয়ক ধারণা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। এ-পর্যায়ে দীনবন্ধু-মানস ও তাঁর সৃজিত-চরিত্র নিমচাঁদে ফাউস্টের প্রভাব অপেক্ষা ইংল্যান্ডের রেনেসাঁসের অন্যতম রূপকার ক্রিস্টোফার মার্লোর (১৫৬৪-১৫৯৩) 'ডক্টর ফস্টাস' (১৫৫৮) নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সাযুজ্য লক্ষ্যযোগ্য। সাহিত্য ও জ্ঞান মানুষকে ত্রিকালজ্ঞ এবং অমর করতে পারবে না জেনে জ্ঞানলোক-নির্বাসিত হয়ে শয়তানের অনুগামী হন মার্লোর ফস্টাস। পরিণামে ভোগ করেন মর্মযন্ত্রণা। রেনেসাঁস-লব্ধ ব্যক্তির আত্মবিকাশের গর্বিত আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিপুরুষের অপরাজেয় শক্তির উপাসনা, মানবতাবাদের বন্ধন-মুক্ত দুর্জয় যাত্রা এবং মানবীয় চেতনার উদ্ভাসন মধ্যযুগীয় ধর্মের প্রত্নপ্রতিমা ও morality play-এর নিগূঢ় প্রভাবে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লে, ব্যক্তির নবলব্ধ উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও দর্পিত অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে থাকে। এই সীমাবদ্ধতার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও, মার্লোর ঈশ্বর মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী নন, তিনি পরম সত্য এবং পরম সুন্দর। এ-কারণে রেনেসাঁসের মানবতাবাদের সঙ্গে এই শক্তির কোন দ্বন্দ্ব নেই। তাই কুহকীবিদ্যা অর্জন করার পরে লুসিফারের কাছে আত্ম-বিসর্জন দিয়েও সত্য, সুন্দর ও ঈশ্বরের জন্য অর্থাৎ জীবনের জন্য তার আকূতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এই মানবিক দ্বন্দ্ব থেকেই রূপায়িত হয়েছে ডক্টর ফস্টাসের জীবনের ট্রাজেডি। মার্লোর ফস্টাস জীবনকে অস্বীকার করে জীবন-পলাতক হতে পারেননি। এই না পারার জন্যে অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত, অন্তর্দ্বন্দ্বে রক্তাক্ত এবং বেদনায় মুহ্যমান ফস্টাস হয়ে উঠেছে ট্রাজেডির নায়ক। কলোনীর অর্ধবিকশিত ও শোষণ-শাসন শৃঙ্খলিত কলকাতাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসমাপ্ত নবজাগরণের নাট্যকার দীনবন্ধুর নিমচাঁদের মধ্যে পাশ্চাত্য নবজাগরণের ব্যক্তিক-শক্তি, সামর্থ্য এবং বিজ্ঞানবোধ প্রত্যাশিত নয়। কারণ ব্যক্তি-সত্তায় কলকাতার ফস্টাসরা জন্মসূত্রে পঙ্গু ও স্ববিরোধী। ইংরেজ-সৃষ্ট নব্য সামন্তশ্রেণী কিংবা বাণিজ্য-পুঁজির উদ্বৃত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করলে গোকুল, নকুল, কেনারাম, অটল প্রমুখের মতো এক ধরনের নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে হয়তো নিমচাঁদ স্থিত হতো, কিন্তু নিতান্ত পরিশ্রমজীবী পিতার সংসারে

জন্মগ্রহণ করায় তার বিদ্যা ও বুদ্ধি নিষ্ফল হয়ে পড়েছে। সীমাবদ্ধ চাকুরির দুয়ার রুদ্ধ ও মধ্যস্বত্ব ভোগের সুযোগ বিনষ্ট বলে সমাজজীবনে সে অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত এবং উদ্বৃত্ত বলে ঘোষিত হলো। অধিত বিদ্যা ও অর্জিত জ্ঞান তাকে সুস্থজীবনে পুনর্বাসিত করতে পারবে না জেনে সেও ফস্টাসের মতো অন্ধকারের উপাসনায় মত্ত হয়ে উঠেছে। অটল, ভোলা, রামমাণিক্য ও কাঞ্চন তার নরক-গমনের সঙ্গী-সাথী। জন্মগত দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও মর্মকোষের পরাজয়-চিন্তার যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য মদের বোতলের আড়ালে, নকুলের বাগানে এবং সঙ্গরসিকতার নির্মোকে সে আত্মগোপন করতে চেয়েছে। কিন্তু জীবনের জন্য, সুস্থতার জন্য এবং প্রার্থিত সুখ-স্বপ্নের জন্য সে বারংবার পিছন ফিরে চেয়েছে। যে-জীবনে তার স্থান হলো না, সে-জীবনে আর সে কোনদিন ফিরে আসতে পারেনি। এই না পারার ব্যর্থতা থেকে একদিকে সে যেমন পাপচক্রকে আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরেছে, আবার অন্যদিকে উন্মোচন করেছে নিজ জীবনের অমোঘ পরিণাম। এ-কারণে আমাদের ধারণা, নিমচাঁদের চিত্ত-সঙ্কটে, আত্ম-উন্মোচনে ও আত্ম-খননে এক মহৎ ব্যক্তির অনিচ্ছাকৃত পতনের ট্রাজেডি অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। মার্লোর ফস্টাসের অনুশোচনা ও আত্মদ্বন্দ্বের মতো নিমচাঁদ শেষপর্যন্ত ব্যক্ত করেছে তার আত্মগ্লানি। স্বর্গের কথা চিন্তা করতে গিয়ে ফস্টাস পাপাত্মা মেফিস্টোফিলিসকে অভিশাপ দিয়েছে, নিমচাঁদের 'মেফিস্টোফিলিস' হচ্ছে 'সময়'। নিমচাঁদ তার অধঃপতনের জন্য ঐ সময়কে অভিযুক্ত করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, ফস্টাস অপেক্ষা নিমচাঁদের সঙ্কট আরো গভীর বলে কখনো সে প্রত্যাবর্তনের কথা ভাবেনি। যাদুবিদ্যা পরিত্যাগ করলে ফস্টাস ঈশ্বরের ক্ষমাসিক্ত হতে পারেন, কিন্তু মদ ছাড়লেও সময় ও সমাজের কাছে নিমচাঁদের পরিত্রাণ নেই। বরং বড়জোর কেনারামের মতো ভণ্ড-তপস্বী ও ক্রীতদাস এবং গোকুলের মতো hypocrite হতে পারে, কিন্তু তার মতো 'moral courage'—এর ব্যক্তির পক্ষে ভণ্ডামী গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, এই পৃথিবীতে নিমচাঁদ সত্যিকার অর্থেই দেশকাল-তাড়িত আত্মবিচ্ছিন্ন এবং নির্মম স্বার্থপর সমাজের বেদনার নায়ক---স্বর্গে তার স্থান হয়নি কিন্তু নরকে তার বিবমিষা, এতদ্‌সত্ত্বেও নরকে তার অবস্থান। সময় ও সমাজের বৃহত্তর পটভূমিতে স্থাপিত বলে নিমচাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ক্ষতবিক্ষত আত্মক্ষরণ এবং আত্মখননের ট্রাজেডি ব্যক্তির

শোচনায় পর্যবসিত না হয়ে শেষপর্যন্ত জাতীয় জীবনের অমোঘ পরাজয় রূপে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। ব্যক্তিকে তার দেশকাল ও সমাজের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে একই সঙ্গে ব্যক্তির ও সমষ্টির ট্রাজেডি উন্মোচন করার এই রীতি বাংলা নাটকে সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব। নাটকটির কাহিনী বিন্যাস, ঘটনাবৃত্ত-নির্মাণ এবং রসপরিণতিতে এই অভিনবত্বই প্রতিফলিত হয়েছে।

খ. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টিশীল ও কালাতিক্রমী কোন শিল্পকর্ম কখনো প্রথাসিদ্ধ পথে বিচরণ করে না। স্রষ্টার ইতিহাসজ্ঞান, সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞা এবং সমাজবোধের রসায়নে রচিত হয় এ-জাতীয় অভিনব রূপবন্ধ। বিষয় ও রীতির নবজাত বৈশিষ্ট্যের রহস্য উন্মোচনে তাই যুগে যুগে সমালোচকেরা বিতর্কিত বিবেচনা উপস্থাপনে শ্রমশীল হন। এ-কারণে শিল্পবস্তুর তাৎপর্যে যেমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না, তেমনি শিল্পীর অনন্য ক্ষমতার গুরুত্বও কমে না। বরং সময়ের তুলাদণ্ডে কালান্তরে একদা উন্মোচিত হয় স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহত্তম চরিত্রধর্ম। দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'ও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথম পর্বের সমালোচকেরা নাটকটির কাহিনী বিন্যাস, ঘটনাবৃত্ত নির্মাণ ও রসনিষ্পত্তি বিচারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও তাঁদের শ্রমনিষ্ঠা তেমন ফলবতী হয়নি। অনেকে শেক্সপীয়রের নাটকের নির্মাণ-কৌশল, রস-পরিণাম এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য নাট্যকারের সৃষ্টিকর্মের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'সধবার একাদশী'র মর্মোদ্ধারে অভিনিবেশী হলেও, সে-সব বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনধর্মী আলোচনা যেমন সমগ্রতা-সন্ধানী নয়, তেমনি পরস্পর-বিরোধী। 'সধবার একাদশী' আলোচনায় ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের মূল্যায়ন একান্ত সীমাবদ্ধ হলেও, তিনি নাটকটির শিল্পরীতি, চরিত্রায়ন এবং বিশেষ করে নিমচাঁদ-চরিত্র বিশ্লেষণে নাট্যকারের 'সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যতা' লক্ষ্য করেছেন।[৭৩] পক্ষান্তরে রামগতি ন্যায়রত্নের সিদ্ধান্ত মতে 'সধবার একাদশী' 'একটি জঘন্যপদার্থ'[৭৪] এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় নাটকটি 'বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত' নয়।[৭৫] সুতরাং লক্ষ্য করার বিষয়, নাটকটির বিষয়গুরুত্ব এবং শিল্পসার্থকতা সম্পর্কে তার জন্মকাল থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট পরস্পর-বিরুদ্ধ দুটি মূল্যায়ন-ধারা সৃষ্টি হয়েছে।

রামগতি ন্যায়রত্নের উত্তরাধিকার লক্ষ্য করা যায়, প্রভু গুহঠাকুরতার ইংরেজি ভাষায় লিখিত বাংলা নাটকের ইতিহাস গ্রন্থে।[৯৬] তিনি নাটকটির মধ্যে 'Lack of good taste' এবং 'Lack of imotional balance'[৯৭] আবিষ্কার করেছেন। এই যুক্তিতে তিনি দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছেন যে, বিষয়-নির্বাচনে নাট্যকার পক্ষপাতদুষ্ট (one sided) এবং এ-কারণেই নাকি আলোচ্য নাটকটির শিল্পগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ অভিযোগ আলোচকের রক্ষণশীল মনোধর্ম-উদ্‌ভূত। শিল্পতত্ত্বের নিরিখে এমন মূল্যায়ন যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি নাটকটির আভ্যন্তর সাক্ষ্যেও অভিযোগটি প্রমাণ করা যায় না।

দীনবন্ধু-মূল্যায়নের দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সজনীকান্ত দাস, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখের মধ্যে। কালীপ্রসন্ন ঘোষ দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভা সম্পর্কে সমালোচনামুখর হয়েও নিমচাঁদের চরিত্রধর্ম বিষয়ে অনেকাংশে সত্যস্পর্শী।[৯৮] লোকেন্দ্রনাথ পালিত 'সধবার একাদশী'কে বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় স্থাপন করে গ্যেটের 'ফাউস্টের' সমতুল্য বিবেচনা করেছেন।[৯৯] তাঁর বিশ্লেষণ যত না তথ্যনিষ্ঠ তার চেয়ে বেশী আবেগান্বিত। প্রকৃতপক্ষে নাটকটির শিল্পরীতি বিষয়ে সর্বপ্রথম স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী' অন্তর্গত 'সধবার একদশী'র ভূমিকা-লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস।[১০০] তাঁদের ধারণা "শিল্পসৃষ্টি হিসাবে 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটক, . . . মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্লিপ্ততা বা detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় শেক্সপীয়রীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষায় একমাত্র 'সধবার একাদশী'কেই খাঁটি নাটক আখ্যা দেওয়া যায়। ইহার চরিত্র-সমাবেশ ও বিকাশ, বাচনভঙ্গী, ঘটনাপ্রবাহ এবং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করে না, বরঞ্চ বাস্তবতায় বিস্মিত করিয়া তোলে। 'সধবার একাদশী'র বার্ত্তালাপ অথবা ঘটনাসংস্থান কুত্রাপি নাটকীয় হইয়া উঠে নাই, স্বাভাবিক পরিণতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।"[১০১] সংলাপ, ঘটনাবৃত্তনির্মাণ এবং চরিত্রায়নের এই ব্যতিক্রমধর্মকে সম্ভবতঃ

'নবরীতি' এবং 'নতুন আঙ্গিক' সাধনা বলে ক্ষেত্র গুপ্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন।[১০২] উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সজনী-কান্ত দাসের অভিমতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভিন্নমত পোষণ করে 'সধবার একাদশী'তে এরিস্টটলীয় কিংবা শেক্সপীয়রীয় আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত ত্রিনীতি, নির্দিষ্ট আয়তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্ত এবং চরিত্রসৃষ্টির প্রথাবদ্ধ ঐক্যবিধিসমূহের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। 'unity of impression'[১০৩]-সৃষ্টির অভিনব প্রয়াস যে নাটকটির শিল্প-কৌশল, তা তিনি যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র কেন এই ভিন্নধর্মী শিল্পরূপ নির্মাণে ব্রতী হলেন এবং এই নবতর আঙ্গিক সাধনায় নাটকীয় বিষয়বস্তু কোন নিগূঢ় ভূমিকা পালন করেছে কিনা, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যায় ক্ষেত্র গুপ্ত নিস্পৃহ। 'সধবার একাদশী'র শিল্পরীতি এবং সৃষ্টি-কৌশল সম্পর্কে সম্প্রতি নির্মলেন্দু ভৌমিক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[১০৪] রীতিকে বিষয়-বিচ্যুত করে স্বতন্ত্র বিবেচনার জন্য আধুনিক শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আমাদের বোধ ও মেধাকে সপ্রশ্ন-সম্প্রসারিত এবং পুনর্জাগরিত করেছে সত্য, কিন্তু 'সধবার একাদশী'র নব্য আঙ্গিক সাধনার মূল-গ্রন্থি যে নাটকটির বিষয়-বিশ্লেষণের সঙ্গে পরস্পরিত, এ-সত্য উন্মো-চিত হয়নি।[১০৫]

প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকে জীবনের বহির্বাস্তব ঘটনাপ্রপঞ্চ, প্রত্যক্ষ-চারী অবয়ব সংস্থান এবং গতানুগতিক নাটকীয় সঙ্কট নির্মাণ থেকে মানুষের অন্তস্তলের রক্তিম চেতনা, নিগূঢ় দৃশ্যপট, মর্মমূলের অপ্রতিরোধ্য অন্তর্ঘাত, অবিশ্বাস, নৈরাজ্য এবং ঔদাসীন্য উন্মোচনের পথিকৃৎ দীনবন্ধু মিত্র। তিনি সর্বপ্রথম উনিশ শতকী জীবনের বাস্তব সীমারেখা, আর্থ-সামাজিক পরিবেশে জীবনের রূঢ়বাস্তবতা এবং সমকালীন মধ্যবিত্তের জটিলতর মনোলোকের অবভাস অত্যন্ত স্পষ্ট করে উপলব্ধি করেন। বহির্বাস্তব সংঘাত নিয়ে যেমন তিনি রচনা করেন 'নীলদর্পণ', তেমনি অন্তর্সত্যকে উপস্থাপন করেন 'সধবার একাদশী' নাটকে। সময় ও সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিমানসের উপর্যুক্ত অন্তর্সত্যকে রূপান্বিত করার লক্ষ্যে তিনি 'সধবার একাদশী' পরি-কল্পনা করেন। এ-কারণে নিমচাঁদ কোন স্বয়ম্ভূ ব্যক্তি নয়, কাল-তরঙ্গে ভাসমান সমষ্টির বেদনাপুঞ্জে নির্মিত ব্যক্তি-চিত্তের রূপক।

এ জন্য এককভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্র-স্বভাবে কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের ব্যক্তিক পরাজয়ের প্রতীকে নিমচাঁদকে অখণ্ডভাবে পাওয়া যাবে না---বরং মাইকেল মধুসূদনের জীবনের ট্রাজিক পরিণাম, দীনবন্ধু মিত্রের চাকুরি জীবনের গ্লানি, হরিশচন্দ্রের অকাল-মৃত্যু ও পারিবারিক বিপর্যয় এবং সিপাহী বিপ্লব ও নীলবিদ্রোহের আপাতঃ নিষ্ফল-পরিণাম প্রভৃতি যুগ-সঙ্কটের সঞ্চয়নে নির্মিত নিমচাঁদের আত্মা। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৃত্তে জীবনের কৃত্রিম আত্মগরিমা, শিক্ষার নিষ্ফল উন্নাসিকতা, সভ্যতাভিমান অথচ সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, অক্ষমতা এবং জীবনের ম্লান নশ্বরতার রূপকল্পে রচিত নাটকটির কেন্দ্রীয় ভাববস্তু। নিমচাঁদের অর্জিত বিদ্যা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ, স্বাতন্ত্র্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ঔপনিবেশিকতায় বন্দী, গার্হস্থ্য-জীবনের স্বপ্ন-সাধ আশ্রিত জীবনে নির্বাসিত, প্রণয়-তৃষ্ণার রুচিবান আগ্রহ অকাম্য রমণীতে আহত বলে জীবনের সুস্থতা, কাম্যতা ও স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-জীবনের অস্তিত্ব সন্ধানে সে হতাশাগ্রস্ত।[১০৬] সধবার একাদশীর কেন্দ্রীয় বিষয় এবং কেন্দ্রীয় চরিত্র উপর্যুক্ত বিচ্ছিন্নতা, হতাশা এবং নিরর্থকতায় আত্মানুসন্ধানী ও সত্যান্বেষী বলে নাটকটি ঘটনামুখ্য গতানুগতিক না হয়ে চরিত্রমুখ্য ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। এ-কারণে বৃত্তের অধীনে চরিত্র বিকাশশীল না হয়ে, আত্ম-খননধর্মী আত্ম-সমীক্ষায় প্রকাশময় হয়ে উঠেছে। এই আত্ম-সমীক্ষার অভিনব রীতিতে কেন্দ্রীয় চরিত্র উন্মোচন করেছে একাধারে নিজ প্রকৃতি এবং উদ্‌ঘাটন করেছে সামাজিক চরিত্রের অন্তঃসারশূন্যতা ও স্ববিরোধিতা। এই নাট্য-প্রক্রিয়ায় ঘটনার গতি, নাটকীয় উৎকণ্ঠা এবং প্রতিপাদ্য-সমর্থিত ইতিবৃত্ত রচনায় দীনবন্ধু মিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্রে আরোপ করেছেন যুগ-আহরিত কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রটির জীবন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টিকোণের সাহায্যে নির্মাণ করেছেন তার অনন্য ভাববস্তু। কেন্দ্রীয় চরিত্র ও ভাববস্তু তাই এ-নাটকে অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পরিত।

দীনবন্ধু মিত্র যুগমানসের বন্ধ্যাত্ব, পঙ্গুত্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রতীকায়িত করতে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপন করেছেন: ১. নিমচাঁদ সমাজ ও সময়-বিচ্ছিন্ন বলে অন্তর্স্বভাবে নিষ্ক্রিয়, ২. সকর্মক-ভূমিকাবর্জিত বিধায় আত্ম-উন্মোচনে ও পরিস্থিতি-বিচারে বাক্‌সর্বস্ব, ৩. আত্ম-দ্বন্দ্ব ও সমাজ-দ্বন্দ্ব প্রকাশে সামাজিক অস্তিত্বের অর্থহীনতা

(meaninglessness), বিচ্ছিন্নতা (alienation) এবং মানব-অস্তিত্বের হতাশা, নঞর্থকতা (existential despair and absurdity) ও আত্মবিরোধ (conflict) প্রকাশে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল। এ-জাতীয় চরিত্রের আত্মপ্রকাশ এবং নাটকীয়বৃত্তে তার সক্রিয় উপস্থাপনের জন্যই তাই সংলাপ এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্যকে সৃষ্টিকৌশল হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া নাট্যকারের কোন বিকল্প ছিল না। এ-কারণে দীনবন্ধু মিত্র অব্যর্থভাবে সংলাপের অভিযোজনশক্তি এবং সংশ্লেষণ গুণ সৃষ্টি করে নাটকটির আভ্যন্তর সঙ্কট, অগ্রগতি এবং রসনিষ্পত্তিগত ঐক্য বিধান করেছেন। চরিত্রসমূহ তাই চিত্তাকর্ষক ঘটনাবলীর মধ্যে ক্রমশঃ বিকাশশীল না হয়ে একটি সামগ্রিক নাটকীয় পরিস্থিতিতে হয়েছে জীবন্ত। একটি বিশেষ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে চরিত্র-সমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অন্তর্বৈশিষ্ট্য আরোপ করায় স্বয়ংসিদ্ধ একটি পরিস্থিতিতে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আপাতঃ নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে এই সক্রিয়তা আবিষ্কার দীনবন্ধু মিত্রের অনন্য নাট্যশক্তির পরিচায়ক। সুতরাং এমন একটি পরিস্থিতি নির্মাণই ছিল এ-নাটকে দীনবন্ধু মিত্রের জন্য সর্বাপেক্ষা বড় চ্যালেঞ্জ। সে-পরীক্ষায় দীনবন্ধু মিত্র উত্তীর্ণ শুধু নন বরং কালোত্তীর্ণ। উনিশ শতকে বাংলা নাটকের সৃজ্যমান পর্যায়ে এ-জাতীয় নিরীক্ষাধর্মের কথা ভাবতে অবাক লাগে। প্রতিভান শক্তি ও অভিযোজন শক্তির গুণে দীনবন্ধু মিত্র ‘সধবার একাদশী’ নাটকের ঘটনা, চরিত্র, সংঘাত এবং রস- পরিণামকে একটি সামঞ্জস্যময় ও অখণ্ড নাটকীয় পরিস্থিতিতে স্থাপন করতে সমর্থ হন। এ-কারণে এর কাহিনী-কাঠামো, চরিত্রচিত্র, ভাবনা এবং পরিণাম হয়ে পড়ে গতানুগতিকতা বিবর্জিত। এই ‘peculiarity’ এবং ‘unconventionality’[১০৭] দীনবন্ধু মিত্রের অক্ষমতাজাত নয়, বরং প্রতিভার অনন্যধর্ম-সৃষ্ট নব্যনাট্য-প্রকৌশল। ঘটনা ও কার্য-ঐক্যকে রূপান্তরিত-অবয়বে ‘unity of impression’-এ চিত্ররূপময় করা হয়েছে। উনিশ শতকের ভাবাদর্শসমূহের আভ্যন্তর সঙ্কট, কেন্দ্রীয় চরিত্রের অন্তর্সঙ্কট যেমন সামগ্রিক ভাব-ঐক্যে সামঞ্জস্যময় হয়ে উঠেছে, তেমনি সমাজ-মূলের জটিলতর গ্রন্থিসমূহের সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রের অন্তর্বিরোধ এবং নির্বাচিত চরিত্রাবলীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রের সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের কার্য-ঐক্য (unity of action)। এই ভাব-ঐক্য এবং কার্য-ঐক্যের আবিষ্কার আর নাটকটির শিল্প-সংগঠন রীতির স্বরূপ উন্মোচন মূলতঃ সমার্থক।

নাটকটির উপর্যুক্ত শিল্পকৌশল অনুধ্যানে শ্রমশীল না হয়ে অনেকে 'সধবার একাদশী'র বৃত্ত-গঠন, চরিত্রসৃষ্টি ও রসপরিণাম নির্মাণ বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ব্যক্ত করেছেন। 'ঘনপিনদ্ধকাহিনী' এবং 'কাহিনী-ঐক্যের' অনুপস্থিতির জন্য এর মধ্যে অনেকে 'নক্সার লক্ষণ' আবিষ্কারে প্রলুব্ধ হয়েছেন।[১০৮] 'সধবার একদশী' সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা দায়িত্বহীন মন্তব্য করেছেন শ্রী বৈদ্যনাথ শীল। তাঁর ধারণা "সধবার একাদশী'র কাহিনী পরিবেশনে নাটকীয় কোনো সংঘাতের বালাই নাই, পতন-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন বোধ নাই।· · নিমেদত্তের মাতলামী যতই মনোজ্ঞ হউক না কেন, ঐ নাটকে কোন চরিত্র নাই। ক্রমবিকাশের স্তর বাহিয়া সুষ্ঠু পরিণতি বা সমাপ্তির যবনিকাপাত করে না।"[১০৯] অভিযোগসমূহের মধ্যে প্রথমতঃ 'সধবার একাদশী'তে কোন কাহিনী নেই, দ্বিতীয়তঃ চরিত্র নেই এবং তৃতীয়তঃ ঘটনার ক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ নেই। এই মূল্যায়ন একদিকে যেমন সমালোচকের রক্ষণশীল নাট্য-দৃষ্টির পরিচয়কে উন্মোচন করে, তেমনি দীনবন্ধু মিত্রের অনন্য নাট্য-প্রতিভাকে অস্বীকার করে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'সধবার একাদশী' প্রথাবদ্ধ শিল্পকর্ম নয়। এ-কারণে শেক্সপীয়রের নাটকের অঙ্গপরিচর্যা এবং চরিত্রায়নরীতির আলোকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'কৃষ্ণকুমারী', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী' নাটকসমূহের বহিরাঙ্গিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংঘাত নিরূপণ সম্ভব হলেও, 'সধবার একাদশী' বিচারে একই রীতি অব্যর্থ নয়। কারণ এই নাটকে ঘটনার 'পতন-অভ্যুত্থান' অপেক্ষা ভাব, ভাবনা ও চেতনার অন্তর্সংঘাতই মুখ্য। এতদ্বিষয়ে নাট্যতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্ত স্মরণীয়, "ঘটনা-প্রধান কাহিনীতে চমকপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্যেই ক্রিয়া-প্রাণতা থাকে এবং সেই 'ক্রিয়া'র প্রকৃতি অতি স্থূল। · · · ভাব প্রধান কাহিনীতে শারীরিক ক্রিয়া থাকে না এমন নয়, তবে কাহিনী প্রধানতঃ ভাবাবেগময় হওয়ায় হৃদয়ের ও মনের ক্রিয়াই লক্ষণীয় হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর কাহিনীর ক্রিয়াপ্রাণতা ভাবাবেগের গভীর সংবেদনার মধ্যে নিহিত থাকে।"[১১০] 'সধবার একাদশী'র ভাবনা ও সমস্যার ক্রিয়া-প্রাণতা উদ্রিক্ত হয়েছে নির্বাচিত চরিত্র ও নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সময় ও সমাজশৃঙ্খলিত পরিস্থিতি থেকে। পুরাণ-প্রসঙ্গ এবং ইতিহাস-ঘটনা নয়, অতি পরিচিত সাধারণ সমাজ-অঙ্গনে দীনবন্ধু মিত্র উপনিবেশ-শাসিত 'নবজাগরণের' যে অসম্পূর্ণতা, সীমা-

বদ্ধতা এবং স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করেন তাকে তিনি বৃহত্তর সামাজিক স্রোতে স্থাপন করেন। এ-জন্যে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব সমষ্টির পরাজয়ে হয়েছে বিস্তৃত।

উপর্যুক্ত বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'সধবার একাদশী'র চরিত্র-সমূহের বহির্বাস্তব-দ্বন্দ্ব সৃষ্টির জন্যে দীনবন্ধু সমকালীন সমাজকেন্দ্র থেকে সাধারণভাবে দু'ধরনের চরিত্রকে শ্রেণীবদ্ধ করেন। একদিকে বিত্তবান সমাজের বিকৃত আভিজাত্যগর্ব, তাঁদের উত্তরাধিকারীদের বাবুসংস্কৃতির স্থূল রসরুচি, অন্যদিকে বিত্ত-ঐতিহ্যচ্যুত নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্য সভ্যতাগর্ব এবং সামাজিক জীবনে ব্যর্থতাজনিত আত্ম-ক্ষয়ের বিকৃত অহঙ্কার--উনিশ শতকের বাংলার মধ্য-পর্যায়ের নাগরিক জীবনের পরস্পর বিরোধী এই দুটি শ্রেণীর অধঃপতন এর আপাতঃ লক্ষণ হলেও মূলতঃ অন্তর্সঙ্কট উন্মোচনই প্রধান লক্ষ্য। অটল ও নিমচাঁদ উভয়েই অধঃপতিত জীবনাচারী হলেও, তাদের পতনের জন্য দায়ী পৃথক কারণ। অটল বিত্তবান সমাজের প্রতিনিধি এবং নিমচাঁদ বিত্তহীন শিক্ষিত সমাজের প্রতিনিধি। ভিন্নতর উদ্দেশ্য এবং স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সময় তাদেরকে একই মদের আড্ডায় টেনে এনেছে। সময়ের স্রোত-তরঙ্গে সুদূর পূর্ববঙ্গ থেকে রামমানিক্য যেমন আছড়ে পড়েছে বিত্তজৌলুসের কলকাতায়, তেমনি অসম্পূর্ণ মানুষ ভোলা এসে জুটেছে অটলের আড্ডায়। এক গ্লাসের অন্তরঙ্গ সহচর হওয়া সত্ত্বেও নিমচাঁদ এবং অটলের মধ্যেকার বিত্ত, বিদ্যা, জীবনবোধ এবং রুচির সংঘাতই নাটকটির প্রাণশক্তি। অটল এবং নিমচাঁদের মধ্যে মিল শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে—দুজনই মদ্যপায়ী এবং স্ত্রী-সংসর্গ বিচ্যুত। অবরোধবাসিনী স্ত্রী সম্পর্কে অটল আবেগহীন, নির্দয় এবং নির্মম, কিন্তু বেশ্যা কাঞ্চন সম্পর্কে আবেগী এবং প্রণয়লুব্ধ ; পক্ষান্তরে নিমচাঁদ বারবিলাসিনী কাঞ্চন সম্পর্কে নির্লোভ ও নির্মম কিন্তু স্ত্রীর অন্তর্বেদনা বিষয়ে সতর্ক ও সংবেদনশীল। গোকুলচন্দ্রের স্ত্রী অপহরণ, কাঞ্চনের সতীত্ব বিষয়ে অটলের উৎকণ্ঠা, অটলের শেক্সপীয়র ও মধুসূদন-বিষয়ক বিদ্যা-পরীক্ষায় উভয়ের ভিতরকার দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের সঙ্গে অটলের পিতা জীবনচন্দ্রের নীতিবোধ, গোকুলচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম অনুমোদিত মদ্যপান-বিরোধী ভূমিকা এবং কেনারামের মূর্খতা সংযুক্ত

করে দীনবন্ধু অটল-নিমচাঁদ দ্বন্দ্বকে দেশকালের পটভূমিতে বিস্তৃত করেছেন। বিত্ত–আভিজাত্য ও সমাজশক্তিতে এরা সব অটলের পূর্ব-সুরি বলে অটলের মধ্যে এদের দুর্নীতি, ভণ্ডামী এবং ভোগাকাঙক্ষা এসে ভর করেছে। জীবনচন্দ্র বিত্ত সঞ্চয় করেছে পরের সর্বনাশ করে, মদ্যপানে ক্লান্ত গোকুলচন্দ্র 'সুরাপান নিবারণী সভা'র নেতা, উকিল নকুলেশ্বর মদ্যপান-রত অবস্থায় সুরাপান বিরোধী বক্তব্যে উচ্চকণ্ঠ---এদের 'অকালকুষ্মাণ্ড' উত্তরসুরি অটল উদ্বৃত্ত অর্থ আর অসম্পূর্ণ শিক্ষায় উন্মত্ত। এই একই সমাজশক্তি ও বিত্তশক্তির জোরে কেনারাম ব্রিটিশ প্রশাসনে অধিষ্ঠিত। মূর্খতা, প্রতারণা এবং ভণ্ডামীতে সে অটলের মতোই নির্লজ্জ। সে একই সঙ্গে হিন্দু সমাজের আদর্শ পুত্র ও ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারমুক্ত প্রতিনিধি। মদ খেতে তার আপত্তি নেই, কিন্তু লোকলজ্জা একমাত্র বাধা, তবে গোপনে বেশ্যালয়ে গমনেও সে পারঙ্গম। এই অথর্ব, পঙ্গু এবং শক্তিমত্ত বিত্তবান সমাজের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, নির্বাসিত ও পতিত নিমচাঁদের সংঘাতই নাটকটির মুখ্য দ্বন্দ্ব।

বিত্তশক্তি ও বিদ্যাশক্তির এই দ্বন্দ্বকে বিশ্বস্ত করার জন্য দীনবন্ধু সচেতনভাবে গার্হস্থ্যজীবনে ও দাম্পত্য-সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'সধবার একা-দশী'র পরিণাম বিস্তৃত করেছেন। অনঙ্গরঙ্গিনীকে অপাত্রে সম্প্রদান, অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর 'একাদশী' এবং নিমচাঁদের স্ত্রীর অপমানিত জীবন মূলতঃ একই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত। পারিবারিক বন্ধনে এবং প্রণয়ধর্মে পরিতৃপ্ত অটলের বোন 'সৌদামিনী'র বিদ্যুতালোকের বিপরীতে রাত্রির নিঃসঙ্গ পদ্মের প্রতীকে 'কুমুদিনী'র ট্রাজেডি উপস্থাপনে, কুমুদিনীর সঙ্গে সৌদামিনীর নব্যশিক্ষা-বিষয়ক বিতর্কে, স্ত্রীর দুঃখে নিমচাঁদের সমবেদনা প্রকাশে এবং অনঙ্গরঙ্গিনীর শিক্ষা, রুচি ও প্রগতির প্রতীক তার কোমরে অ্যালবার্ট চেনে ঝুলানো ঘড়ির স্থান পরিবর্তনের বিপর্যয়ে বিদ্যাহীন বিত্ত এবং বিত্তহীন বিদ্যার সামাজিক দ্বন্দ্বটি প্রকাশিত হয়েছে। এই সামগ্রিক সামাজিক দ্বন্দ্ব ও বিপর্যয়ের মধ্যে নিমচাঁদের নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিত্তকৌলীন্য সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত সনাতন-পন্থী জীবনচন্দ্র এবং ব্রাহ্মপন্থী গোকুলচন্দ্র। তাঁদের উভয়ের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা জড়িত বলে অটলের অধঃপতন রোধে তারা

একত্রিত হলেও, পুরাতন স্ত্রী এবং আধুনিকা স্ত্রী বিষয়ে বিতর্কে তারা সনাতন শিক্ষা ও নব্যশিক্ষার সামাজিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিদ্যাহীন বিত্ত, যুক্তিহীন স্নেহ এবং জন্মগত উত্তরাধিকার যে অধঃপতনের মূল, ইঙ্গিতে গোকুলচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এমন মন্তব্য প্রকাশ করলেও স্বীয় শ্রেণী-অবস্থান থেকে সে নিমচাঁদকে আক্রমণ করেছে।

উপর্যুক্ত তিনটি মৌলভাব-দ্বন্দ্বে এবং অসংখ্য গৌণদ্বন্দ্বের কেন্দ্রে নিমচাঁদকে স্থাপন করে দীনবন্ধু মিত্র একদিকে যেমন অটলের অধঃপতনের অবরোহণকে স্পষ্ট করেছেন, অন্যদিকে নিমচাঁদের পরাজয়, আত্মক্ষয় এবং সুগভীর মর্মযন্ত্রণার পূর্বাপর ইতিহাসকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। পরাভূত জীবনের এই অস্থিহীন চেতনাকে নাটকীয় অবয়ব প্রদানের জন্য ঘটনা অপেক্ষা সংলাপই অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নিমচাঁদের আত্মখনন ও আত্ম-উন্মোচনের রীতি অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্র বৃহত্তর সময় ও সমাজের সঙ্গে তার অন্তর্সংঘাত চিত্রিত করেছেন। এ-কারণে সে কাহিনী-কাঠামোয় আবর্তিত নয়, বরং বাগবৈদগ্ধ্যে চতুর, চঞ্চল এবং জীবন্ত। ভাবকে অঙ্গ দেবার জন্য কেন্দ্রীয় চরিত্রের এই সংলাপ-তীক্ষ্ণতা ছিল অপরিহার্য। কারণ নাটকের মধ্যে যে ভাবদ্বন্দ্ব নির্মিত হয়েছে তা অনেকাংশে নিমচাঁদের অনন্য সংলাপ-নির্ভর। সংলাপের সংশ্লেষণ গুণের বলে এবং গ্রাহিকাশক্তির বিস্তৃতিতে নাটকের ভাবপুঞ্জ শেষ পর্যন্ত একটি সমন্বিত ঐক্য-বিন্দুতে এসে মিশেছে। নাটকের তিনটি অঙ্কে এবং নয়টি দৃশ্যে অভিব্যঞ্জিত হয়ে ভাব-ঐক্য প্রাথিত একটি কাহিনী-ঐক্যে যেন সমর্পিত হয়েছে। কলোনির জটিলতর সমাজ-স্রোতের মধ্যে বিত্তহীন, প্রতিষ্ঠাহীন ও মর্যাদাশূন্য একজন বিবেকবান, মেধাবী এবং বিদ্বান ব্যক্তির অন্তর্সঙ্কটের রক্তপুঞ্জে এই কাহিনী বহুবর্ণিল। এ-কারণে এর রঙ, রেখা এবং রূপক-অর্থ নিয়ে বিদ্বৎমহলে এতো বিতর্ক। নিমচাঁদ তার বর্তমান জীবনযাপনে এবং অস্তিত্বের নিগূঢ় উচ্চারণে যতই অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছে, তার অগ্রন্থিত জীবন-নাট্যের খণ্ডচিত্র ততই যেন তার বেদনার রঙে রঞ্জিত হয়ে আলোছায়াময় অখণ্ড চিত্রের রূপাবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে। নাটকের প্রতিটি দৃশ্য তাই আকর্ষণ করে অখণ্ড মনোযোগ। নিমচাঁদের

কোন উক্তি বা প্রত্যুক্তিকে তাই কখনো বিরতিহীন বক্তব্য, অফুরন্ত কথা এবং ধৈর্যহীন সংলাপ বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় ব্যক্তির জীবনমূল-মথিত সত্যের নির্ভয় উচ্চারণ। উপনিবেশের অস্থিরবৃত্তে আবর্তময়, সামাজিক বন্ধন থেকে পতিত এবং স্বীয় জীবনাকাঙ্ক্ষা থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত এক রুদ্ধ, অভিমানী এবং দুঃখী মানুষের সত্যভাষণ সকলকে আকর্ষণ করে। একটি বিরাট জীবনাদর্শগত পরিস্থিতি থেকে নিমচাঁদ সংগ্রহ করে স্পষ্ট ভাষণের এই সক্রিয়তা, এ কারণে তার সংলাপ নিজগুণেই হয়েছে সকর্মক। নাটকটির ভাব-ঐক্য ও কাহিনী-ঐক্য নির্মাণে এই সংলাপও পালন করেছে দূরসঞ্চারী ভূমিকা।

দীনবন্ধু মিত্র অত্যন্ত সচেতনভাবে 'সধবার একাদশী'র মৌল প্রতিপাদ্য এবং মূলভাব নির্ধারণ করেছেন। বিত্ত-কৌলীন্য-উদ্ভূত অপসংস্কৃতির পরিবেশে উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত শিক্ষিত বিবেকবান ব্যক্তির অনিবার্য পতন, স্ববিরোধ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব রূপায়ণই নাটকটির মূল ভাব (root-idea)। নিমচাঁদ সেই বিত্তহীন বিবেকবান ব্যক্তি। অপসংস্কৃতির প্রতিভূ নকুলেশ্বর, গোকুলচন্দ্র, অটল; বিত্তশক্তির প্রতিনিধি জীবনচন্দ্র। বিত্ত-আভিজাত্য এবং প্রশাসন-বৈষম্যের সামাজিক প্রতিপত্তি এবং পঙ্গুত্বের প্রতিনিধি কেনারাম ডেপুটি। নকুলেশ্বর, গোকুল-চন্দ্র, জীবনচন্দ্র, অটল এবং কেনারামের 'পাপদত্ত বিত্ত' এবং এই বিত্ত-উদ্ভূত অন্যায় সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে নিমচাঁদের বিত্ত-ব্যর্থতা, চিত্তসঙ্কট এবং পতনের চিত্র-অঙ্কনই দীনবন্ধুর লক্ষ্য। যে সমাজের নিষ্ঠুর আচরণে এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বে নিমচাঁদ পতিত বলে চিহ্নিত, সেই সমাজ ও প্রশাসনের অন্যায়-আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও সুবিধা-প্রাপ্ত শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গতভাবে সে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে। জীবনচন্দ্রের বিত্তশক্তি ও সমাজশক্তি তাকে করেছে পতিত এবং পংক্তিচ্যুত। সুস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ বলে, নিমচাঁদ তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ এবং 'মাতাল যাত্রানির্ব্বাহ' করার কৌশল হিসেবে তাই জীবনচন্দ্রের পুত্র অটলকে কুপথে টেনে আনতে আগ্রহী। যে বিত্ত তার করায়ত্ত নয়, যে বিত্তশক্তি তাকে অধঃ-পাতে ঠেলে দিয়েছে—এইভাবে সেই বিত্তে নিমচাঁদ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রথম দৃশ্যে অটলকে অধঃপতনে টেনে আনবার জন্যে

নিমচাঁদের ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার এবং নাটকের শেষ দৃশ্যে অটলের উন্মত্ত আচরণের মধ্যে নিমচাঁদের প্রতিশোধ-স্পৃহার সেই অসুস্থ পরিণাম চিত্রিত হয়েছে। এই প্রতিপাদ্যকে বিশ্বস্ত, সক্রিয় এবং গতিময় করার জন্য নকুলেশ্বর, কাঞ্চন, ভোলা, রামমাণিক্য, মদ প্রমুখ চরিত্র ও উপকরণ আমদানী করা হয়েছে। এদের সামগ্রিক প্রভাবে অটল অধঃপতনে, মদ্যপানে এবং বেশ্যাপালনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে আর 'এক ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়"[১১] ভেবে নিমচাঁদ অটলের পতনে ক্রমাগত ইন্ধন দিয়েছে। এই 'মাতাল প্রতিপালনে'র সূত্রে ভোলা, রামমাণিক্য ও চাকর দামাকে নির্বাচন করা হয়েছে। উত্তেজক উপাদান রূপে আমদানী করা হয়েছে ব্রান্ডি আর বারবিলাসিনী। এই উপাদান ও উপকরণের মধ্যে অতিদ্রুত অটলের 'নরকনিমজ্জন' সমাপ্ত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, 'সধবার একাদশী' কোনক্রমেই মদ্যপানের কাহিনী নয়, বরং চরম মূল্যে এটি নিমচাঁদের বিত্ত-ব্যর্থতা, চিত্ত-সঙ্কট এবং আত্ম-উন্মোচনের ইতিবৃত্ত। নিমচাঁদের অন্তর্গত ক্ষোভ, প্রতিশোধ-স্পৃহা, আত্মক্ষয় এবং অন্তর্দ্বন্দ্বকে 'সুরাপান নিবারণী সভা'র পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে দীনবন্ধু নিমচাঁদ-চরিত্রে ব্যাপক সামাজিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন মাত্র। এ-কারণে নকুলেশ্বর, গোকুলচন্দ্র, জীবনচন্দ্র এবং কেনারামের সঙ্গে তার বিরোধ ও আত্ম-সঙ্কট, পরাজয় শেষপর্যন্ত দেশকালের পরাজয়ে রূপলাভ করেছে। শিক্ষা আছে বিত্ত নেই, যোগ্যতা আছে জীবিকার্জনের পেশা নেই, মননসমৃদ্ধ প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু যোগ্য নারীতে অধিকার নেই---উনিশ শতকের বিত্তহীন পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণীর এই সাধারণ ব্যর্থতা, ক্ষোভ এবং রক্তাক্ত সংবেদন-শীলতায় নিমচাঁদের ট্রাজেডি পরস্পরিত বলে 'সধবার একাদশী' যুগদর্পণরূপে পরমমূল্য লাভ করেছে। দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী'র অঙ্ক-গর্ভাঙ্কের স্বল্প পরিসরে জীবনের এই পতনের, ক্ষয়ের এবং ক্রন্দনের ইতিহাসকে নাট্যরূপ দিয়েছেন। অকাম্য জীবনে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে বসে জীবনের সুস্থতার জন্য, আকুলতার জন্য নিমচাঁদ ক্রন্দন করেছে। কিন্তু সময় ও সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবস্থায় আকাঙ্ক্ষিত সে-জীবনে কোন-দিন নিমচাঁদ প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না জেনে পতিত জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। এই ঘৃণিত জীবনের সর্বনাশা খেলায় অটলকে মদ্যপাত্রে ও কাঞ্চনের গ্রাসে ঠেলে দিয়ে সে ঐ সময় ও সমাজের প্রতিশোধস্পৃহায়

উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। নিমচাঁদ চরিত্রের এই ক্ষয় ও দ্বন্দ্বকে রূপময় করার জন্যে দীনবন্ধু 'সধবার একাদশী'র দৃশ্যাবলীর পরিকল্পনা করেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নিমচাঁদের ষড়যন্ত্রকে কার্যকর করার লক্ষ্যে অটল ও কাঞ্চনকে উপস্থিত দেখা যায়। নকুলেশ্বরের উপস্থিতি এই অংশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নকুলেশ্বর বক্তব্যে মদ্যপান-বিরোধী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দারুণভাবে মদ্যাসক্ত। দীনবন্ধু মিত্র তার মুখে 'সুরাপান নিবারণী সভার' প্রশংসাবাক্য সংযোজন করে এই সভার আভ্যন্তর দুর্বলতা এবং সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকের বিত্তবান সমাজের অন্তর্বিরোধ উন্মোচন করেছেন। এই দুর্বলতা ও স্ববিরোধিতার সুড়ঙ্গপথে যে অটল অধঃপতনকে বরণ করে নেবে, তার অনিবার্যতাকে ইঙ্গিতময় করা হয়েছে। লক্ষ্যযোগ্য যে, নকুলেশ্বর ও অটল একই সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার প্রতিনিধি। বিত্তবান নকুলেশ্বর-কাঞ্চনের সম্পর্ক বিত্তকৌলীন্য ও বাবুসংস্কৃতির সম্পর্ক। নিমচাঁদ নকুলেশ্বরের এই চরিত্র কৌশলে অটলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে আগ্রহী বলে, সে কাঞ্চন সম্পর্কে মোহমুক্ত। কিন্তু অটল দ্বন্দ্বময়। নকুলেশ্বরের দুর্বলতা এবং নিমচাঁদের প্ররোচনায় শেষপর্যন্ত অর্ধশিক্ষিত ধনীপুত্র অটল 'টল টল' করে উঠে মদ্যপান আর বেশ্যানুরক্তিতে। এইভাবে প্রথম দৃশ্যেই নিমচাঁদের 'স্বপ্ন' সার্থক হয়ে ওঠে। "My boat sails freely, both wind and stream"[১১২] বলে নিমচাঁদ আনন্দও প্রকাশ করে। নিমচাঁদের বিশ্বাস: "ওর বাপ অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্ম্মে ব্যয় হক।"[১১৩] যে মেধাশক্তি কোন সৎকর্মে ব্যবহৃত হলোনা, আত্মক্ষয়ী ধ্বংসে তা লিপ্ত হলো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটি সামাজিক ভাবাদর্শ, একটি অধঃপতিত সময় এবং তার আভ্যন্তর ক্ষয়কে পটভূমি করে নাটকটির পট উন্মোচিত হয়েছে। এই দৃশ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, নকুলেশ্বর, অটল এবং কাঞ্চনের উপাদান-মূল্য যাই থাক, পরম লক্ষ্য নিমচাঁদের চরিত্র-স্বভাবের ক্রমবিকাশ। তার চরিত্রকে প্রকাশময় ও দ্বন্দ্বময় করার জন্যই অন্যান্য চরিত্রকে নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য তা অনেকাংশে যুগচিহ্নিত এবং নিমচাঁদের প্রেক্ষণবিন্দুতে সে-পরিচয় উচ্চারিত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দীনবন্ধু নিমচাঁদের চরিত্রকে দ্বন্দ্বময় এবং প্রথম দৃশ্যে উল্লেখিত 'সুরাপান নিবারণী সভা'র সামাজিক গুরুত্বকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে অটলের পিতা জীবনচন্দ্র ও সংস্কারবাদী গোকুলচন্দ্রকে উপস্থাপন করেছেন। অটলকে নিমচাঁদের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে এদের আগমন বলে নিমচাঁদের সঙ্গে এদের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এই সংঘাতে জীবনচন্দ্র ও গোকুলচন্দ্রের পরাজয়ও অনিবার্য। কারণ সুনীতির প্রবক্তা হলেও, এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস একইভাবে কলঙ্কিত। এই অন্তর্গত দুর্বলতার সুযোগে অটল আরো বেশী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কুমুদিনীর প্রেক্ষণবিন্দু দিয়ে অটলের সেই অধঃপতন চিত্রিত করা হয়েছে। এই অধঃপতন যে আরো কিরূপ বীভৎস হতে পারে দীনবন্ধু তা দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সক্রিয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নিমচাঁদ যে বলেছিল 'মাতাল প্রতিপালনে'র কথা, সেই মাতালের সমাবেশ ঘটেছে এই দৃশ্যে। অটলের বৈঠকখানায় বেশ্যা কাঞ্চন, জামাই বাবু ভোলাচাঁদ, পূর্ববঙ্গীয় রামমাণিক্য, এমন কি ডেপুটি কেনারাম তার আরদালীসহ উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় ও চতুর্থ গর্ভাঙ্ক এই অধঃপতিত সন্তানের সংশোধনার্থে জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র এবং বৈদিক ব্রাহ্মণসহ প্রয়াস-প্রযত্নে নিবেদিত। কিন্তু সে-প্রয়াস যে নিরর্থক তা প্রমাণিত হয়েছে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। মাতালদের মদ্যপান, চীৎকার এবং অশ্লীল বখামীর মধ্যমণি রূপে নিমচাঁদ এই অংশে পুনরায় আত্মসমীক্ষায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। অন্তর্গত প্রতিশোধস্পৃহা এবং নিগূঢ় মনোগূঢ়ৈষা থেকে সে অটলকে অন্ধকারে টেনে আনতে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করেছিল--- কিন্তু এর পরিণাম দেখে নিমচাঁদও বিস্মিত। নাটকের শেষ দৃশ্যে অটল গোকুলচন্দ্রের স্ত্রীকে হিজড়ের দ্বারা অপহরণ করতে গিয়ে নিজ স্ত্রী কুমুদিনীকে বাইরে বের করে এনে তার নষ্টামির চরম অবস্থা উন্মোচন করে। এই অধঃপতনকেও নিমচাঁদ স্বীকার করে নিতে পারেনি। এই অন্তর্গত শুচিতা ও মাত্রাজ্ঞানের মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে নিমচাঁদের দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্য। নকুলেশ্বর, জীবনচন্দ্র, গোকুল-চন্দ্রকে সরাসরি সংঘর্ষে না হলেও, অটলকে ক্রমান্বয়ে অধঃপাতে টেনে নিয়ে নিজ বাসনায় জয়ী হয়েছে। অটল, কেনারাম, ভোলাচাঁদ এবং রামমাণিক্যের আড্ডায় থেকেও সে ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে তাদেরকে

ক্ষতবিক্ষত করেছে। এইভাবে নিজের সংকল্প, জিদ, অহঙ্কার এবং বিকৃতির চরম প্রকাশেও সে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর সামাজিক বিপর্যয় এবং স্বীয় জীবনের নিষ্ফলতা সম্পর্কে নিমচাঁদ আত্মগ্লানি অনুভব করেছে। সুতরাং 'সধবার একদশী', রামগতি ন্যায়রত্ন কথিত 'মাতালের কথা'-মাত্র নয়। সময় ও সমাজের বৈরী ও নষ্ট পরিবেশে ব্যর্থ মানুষের অন্তর্ময় ট্রাজেডি উন্মোচনই এর প্রতিপাদ্য। 'সধবার একাদশী'তে বিধৃত চরিত্রসমূহের সঙ্গে নিমচাঁদের অন্তর্সংঘাতের স্বরূপ বিশ্লেষণে উপর্যুক্ত বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

'সধবার একাদশী' নাটকে দু'ধরনের চরিত্রের দু'টি দল তৈরী করা হয়েছে। নিমচাঁদ কখনো দলগত চরিত্রসমূহ যেমন নকুলেশ্বর, জীবনচন্দ্র এবং গোকুলচন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে; আবার কখনো অটল, কেনারাম, ভোলাচাঁদ, রামমাণিক্য এবং কাঞ্চনকে আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণের কারণ মূলতঃ তার ব্যর্থজীবনের পরাজয়কে ভুলে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। সমাজের মধ্যে যারা প্রতিষ্ঠিত এবং সৎব্যক্তি বলে পরিগণিত তাদের প্রতিনিধি গোকুলচন্দ্র এবং রামধন রায়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নকুলেশ্বর রামধন রায়ের 'সুরাপান নিবারণী সভা'র সদস্যপদ গ্রহণের প্রশংসা করলে, নিমচাঁদ তীব্রভাষায় তার প্রতিবাদ করে, "তার ত সভ্য হওয়া নয়, জাবর কাটা---তিনি বিশ বৎসরে যে কারগো বোঝাই নিয়েছেন, বিশ বৎসর যাবে হজম কত্তে---তিনি সভায় বসে মদের জাবর কাটছেন"।[১১৪] গোকুলচন্দ্র এই রামধন রায়ের সমতুল্য। বিশ্বাস আর আচরণের পার্থক্য নিমচাঁদ সহ্য করতে পারে না বলে রোগের ভয়ে মদ ছাড়ার সে পক্ষপাতী নয়। নকুলেশ্বরের এমন ভণ্ড আচরণকে তাই এই বলে খণ্ডন করে যে, "পীড়া হয় প্রতীকার কর, মেডিকল সায়েন্স হয়েছে কি জন্যে!"[১১৫] যে নকুলেশ্বর 'সুরাপান নিবারণী সভা'র সমর্থক, সে নিজে কিন্তু মদ্যপায়ী। এ-সম্পর্কে তার যুক্তি এই যে তার মদ্যপানে 'সংস্কার' হয়ে পড়েছে, তাই মদ পরি-ত্যাগ সম্ভব হচ্ছে না। বস্তুতঃ সে-জন্যে এই তথাকথিত শক্তিমত্ত সমাজপতিদের প্রতি নিমচাঁদের শ্রদ্ধাবোধ ছিল না, বরং তাঁদের স্ববিরোধী আচরণে সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো। অটলকে সে 'প্যারিসাইড,

তোর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়'[১১৬] বলে নিন্দা করে। কাঞ্চনকে 'মদ্যলোভী স্বৈরিণী' বলে উপহাস করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আক্রমণের ও উপহাসের মাধ্যমে নিজের পরাজয়ের আক্রোশ মিটাতে চাইলেও তার বেদনাই হয়েছে প্রকাশিত। যে অসৎ-সঙ্গের বৃত্ত রচনার জন্য অটলকে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নরকে টেনে আনে, সেই নরকের বাসিন্দাদের সে ঘৃণা করে। ভোলাচাঁদ তার দৃষ্টিতে 'কুর্ম্ম অবতার', 'wicked urchin', রামমাণিক্য নিতান্ত অশিক্ষিত, অটল মূর্খ 'রমানাথের এঁড়ে' এবং কেনারাম একটি দর্শনীয় জন্তু বিশেষ। কেনারামকে একটি ঘরে আটকে রেখে টিকিট বিক্রির প্রশ্ন উত্থাপন করে নিমচাঁদ "মোপাস্বাল হতে শাম্‌লা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য জানয়ার এসেচে"[১১৭] বলে রঙ্গ-রস করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সুস্থ জীবনে তার প্রতিষ্ঠা হলো না বলে অসৎ জীবনকে সে অঙ্গীকার করে। কিন্তু সেখানেও শান্তিবোধ করতে পারলো না। জীবনের সুস্থতা তাকে বিভ্রান্ত করে, বিমূঢ় ও অশ্রুসিক্ত করে। জীবনের এই ত্রিমাত্রিকতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে 'সধবার একাদশী' নাটকের নয়টি দৃশ্যে। সুতরাং লক্ষণীয় যে, কাহিনীর পিনদ্ধ সংযোগ সাধনে নাটকটি শেক্সপীয়রীয় রীতিতে আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত না হলেও, নিমচাঁদের চরিত্রের উপর্যুক্ত ত্রিমাত্রিক দ্বন্দ্বের সাহায্যে দৃশ্য-পরম্পরায় একটি ব্যঞ্জনার-ঐক্য নির্মাণ করা হয়েছে। ঘটনার উল্লম্ফন ধর্মের ফাঁকটুকু ভরে দেয়ার জন্য দীনবন্ধু সচেতনভাবে অপ্রধান চরিত্রাবলী নির্বাচন করেছেন। উনিশ শতকী নীতিহীনতার যে-সামাজিক পটভূমিতে নিমচাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে, এ-সব চরিত্র নিমচাঁদ-চরিত্রের বৈপরীত্য সাধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। নীতিহীনতা যে কি ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা উন্মোচনের জন্য অটল, কাঞ্চন, নকুলেশ্বর এবং কেনারাম ছাড়াও রামমাণিক্য এবং চাকর দামার চরিত্রও উল্লেখযোগ্য। শহর কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির নম্রতা পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ রামমাণিক্যকে সমাজ-বিচ্ছিন্ন করে তোলে। অনুকরণ-প্রিয়তার সর্বনাশা উচ্চারণ লক্ষ্য করি তার চরিত্রে, তবু সে তথাকথিত নাগরিক-আভিজাত্য অর্জন করতে পারেনি। "এতো অকাদ্য কাইচি তবু ক্কল্‌কত্তার মত হবার পারচি না? ক্কলকত্তার মত না করছি কি? মাগী বারী গেচি, মাগুরি চিকোন দুতি পরাইচি, পোরার বারীর বিস্‌কাট বব্বেকান করচি, বাণ্ডিল খাইচি

——এতো কর্য্যাও কুলকত্তার মত হবার পারলাম না' তবে এ পাপ দেহতে আর কাজ কি, আমি জলে জাপ দিই, আমারে হাঙ্গোরে কুমিরে বক্কোন করুক।"[১১৮] গ্রামীণ জীবনের সরল মানুষের এই আত্ম-উন্মোচনে বিত্ত-কৌলীন্য এবং ঔপনিবেশিক সভ্যতার আভ্যন্তর ক্লেদ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রামীণ এবং সরল বলেই তার অন্তর্বেদনা স্ফটিকা-য়িত হয়েছে কিন্তু শহরের গৃহভৃত্য দামা নগরের মানুষের মতোই নীতিহীনতায় নির্দ্বন্দ্ব। পাপকর্ম, দুর্নীতি এবং চরিত্রহীনতা সর্বদা নিম্নগামী বলে প্রভু অটলের সংসারের দুর্নীতি ও আত্মসাৎপ্রবণতা ভৃত্য দামাকেও স্পর্শ করেছে। প্রভুর জিনিষ চুরি করতে তার বাধে না। রামমাণিক্য নগরের নোংরা পরিবেশে বসে বিক্রমপুরের গ্রামে স্ত্রী ভাগ্যধরীর জন্য রক্তাক্ত হয়েছে, কিন্তু দামা অটলের গৃহে চুরি করে বিত্ত সঞ্চয় করে 'কোটা বালা খানা'[১১৯] করার স্বপ্ন দেখে। বৈদিক ব্রাহ্মণ চরিত্রটিও পরাশ্রয়ী মনোবৃত্তি এবং স্বার্থপরতায় চিহ্নিত। অটলের চরিত্র সংশোধনের জন্যে তাকে কাশী নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্রের মধ্যে তার স্বার্থ-চিন্তার অভিলাষ গোপন ছিল। এই সব অপ্রধান চরিত্র আমদানী করে দীনবন্ধু সমকালীন সমাজের অবক্ষয়িত অবয়ব, নিমচাঁদ চরিত্রের দ্বন্দ্ব এবং অটলের পতনের খণ্ড-বিখণ্ড দৃশ্যপুঞ্জকে অখণ্ড ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। উপর্যুক্ত সামাজিক নৈরাজ্য এবং নৈতিক অধঃপতনের পটভূমিতে নৈতিকশক্তির প্রবল প্রতিনিধি নিমচাঁদের পতন দ্বন্দ্বময়, সংক্ষুব্ধ এবং বেদনাময় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিমচাঁদ চরিত্রের এই অধঃ-পতন দৃশ্যায়ন দীনবন্ধু মিত্রের মৌল প্রতিপাদ্য নয়——বস্তুতঃ অনিবার্য নিমজ্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে এবং সংস্থাপিত কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানবিক-আকাঙ্ক্ষা ও সুস্থ জীবনাভীপ্সার উন্মোচনই তাঁর লক্ষ্য। 'সধবার একাদশী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যটিতে অবক্ষয়িত সমাজের সঙ্গে নিমচাঁদের পরাজয়, সংঘর্ষ এবং আত্মঘোষণায় উপর্যুক্ত মৌলভাববস্তু প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্যটি পরিকল্পনায় দীনবন্ধুর অনন্য নাট্যপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। 'নীলদর্পণ' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে দীনবন্ধু এ-জাতীয় শিল্পরীতির প্রথম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন।[১২০] স্বীয় কৃতকার্যতায় উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীকালে নাটকীয় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অন্যতম কৌশল হিসেবে তিনি এই রীতিকে অবলম্বন করেন। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয়

গর্ভাঙ্কে 'রাজার উদ্যান', দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিদ্যাভূষণের 'খিড়কির সরোবর', 'কমলে কামিনী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে 'রাজধানীর অন্দরের কুসুম কানন' প্রভৃতি দৃশ্যাবলী মূলতঃ একই ধরনের পরিণামী-উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। এই সব দৃশ্য আপাতঃবিচ্ছিন্ন মনে হলেও, তা উল্লিখিত নাটকসমূহের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সামগ্রিক উদ্দেশ্যে অবিচ্ছেদ্য। অনুরূপ শৈল্পিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গোকুলচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে 'চিতপুর রোড' দৃশ্যটি পরিকল্পিত হয়েছে। এই দৃশ্যে জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র, অটল, কেনারাম প্রমুখ বিত্তশক্তির প্রতিভূদের সঙ্গে নিমচাঁদের প্রত্যক্ষ সংঘাত এবং পতনের সামাজিক স্বরূপ প্রতীকায়িত হয়েছে। 'চিতপুর রোড' নামাকরণও তাৎপর্যপূর্ণ। দারোয়ান রঘুবীর সিং, অযোধ্যা সিং, একজন দাসী, দুজন বারবিলাসিনী, বৈদিক এবং দুজন পাহারাওয়ালার উপস্থিতির সামগ্রিক আয়োজনে সমকালীন কলকাতার জনজীবনের অবক্ষয়ের পটে কৌলীন্যের প্রতীক গোকুলচন্দ্রের বাড়ীর অবস্থান নির্বাচন করা হয়েছে। সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিমচাঁদের জন্য এ-বাড়ীর প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়ে বিত্তবান সমাজের দৃষ্টিকোণে সভ্যতা ও শিক্ষাগর্বী বিত্তহীন ব্যক্তির বিপন্ন সামাজিক অস্তিত্বকে দীনবন্ধু রূপান্বিত করেছেন। হেয়ার স্কুলের বাবু ক্লাসের 'রমানাথের এড়ে' অটল, অর্ধশিক্ষিত ও ভণ্ড কেনারাম, এমনকি মাতাল ভোলাচাঁদ এই বাড়ীতে সম্মানিত অতিথি। পক্ষান্তরে অটল ও কেনারাম আত্মসম্মান ও লোকনিন্দার অজুহাতে নিমচাঁদকে এ-বাড়ীতে না নেবার 'conspiracy'-তে সতর্ক। এই ষড়যন্ত্র আঁচ করে নিমচাঁদ উপলব্ধি করে অটল, কেনারাম, এমন কি ভোলা ও রামমাণিক্যের বিচার করার অধিকারও তার নেই। সময় ও সমাজের নিষ্ঠুর আচরণে স্বয়ং নিমচাঁদই আজ বিচারের আসামী। অপদার্থ, অশিক্ষিত ও ছদ্মবেশী এই সমাজকে ব্যঙ্গ করে তাই সে উন্মোচন করে তার রক্তাক্ত হৃদয়, "ডেপুটি বাবু, আমি তোমার পিনালকোড, এতে সব ক্রাইম আছে, আমারে হাত ধরে লও, নইলে বাবা পড়ে মরি।"[১২১] এই আত্মসমর্পণও নিষ্ঠুরভাবে উপেক্ষিত হয় অপচিত সমাজের প্রতিনিধি অটল ও কেনারামের কাছে। চিতপুরের রাস্তায় তাকে আক্ষরিক অর্থেই দারোয়ান দ্বারা ভূলুন্ঠিত করা হয়।

নিমচাঁদের এই পতন এবং তৃতীয় অঙ্কে অটল কর্তৃক অনঙ্গরঙ্গিনীকে অপহরণের নাট্যিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে এই দৃশ্যে বিশেষ ভূমিকায় দুজন দারোয়ানের উপস্থিতি দীনবন্ধুর অনন্য সামঞ্জস্যবোধ ও নাট্য-কৌশলের পরিচায়ক। অযোধ্যা সিং-এর ভাইয়ের সঙ্গে তার স্ত্রীর পলায়ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করে এ-দৃশ্যে একদিকে অটলের পরস্ত্রী অপ-হরণের পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয়েছে, অন্যদিকে সামাজিক কৌলীন্যের প্রতীক গোকুলচন্দ্রের বাড়ীতে নিমচাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণার অন্তঃসারশূন্যতা উন্মোচিত হয়েছে। গোকুল ও অটলের বিত্ত, আভি-জাত্য এবং সম্পদের পূর্ব-ইতিহাস যেমন সংশয়াচ্ছন্ন, তেমনি পাহারা-দারও ব্যক্তিক জীবনে আত্মক্ষত। এ-জন্যে যুগসঞ্চিত অবক্ষয় ও নৈতিক স্খলনের পাহারাদার-রূপে দারোয়ানদ্বয়ের ভূমিকা হয়েছে সুদূরপ্রসারী। এই তথাকথিত সামাজিক দুর্নীতি ও শুচিতার রক্ষক দারোয়ানের হাতে লাঞ্ছিত হয় নিমচাঁদ। অথচ বাড়ীর মালিক ও পাহারাদার উভয়ই যুগের চরিত্রহীনতায় কলঙ্কিত। মাতাল অবস্থায়ও নিমচাঁদ ভোলেনি যে, কাঞ্চনের 'সতীত্ব' ও গোকুল বাবুর বাড়ীর 'কৌলীন্যে'র মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। এ-কারণে কেনারাম যখন সামনের দারোয়ান দ্বারা সুরক্ষিত বাড়ীকে 'গোকুল বাবুর বাড়ী' বলে পরিচয় দেয়, তখন নিমচাঁদ তার স্বভাব-সুলভ ব্যঙ্গের ভাষায় বলে, "কেউ রেখেছে?"[১১২] যে সুনীতি রক্ষার জন্য এত দারোয়ানের ব্যবস্থা তা যে প্রকৃতপক্ষে 'public house' অর্থাৎ একটি পতিতালয়, এই স্পষ্ট উচ্চারণে নিমচাঁদ সমাজের অন্তর্গত ক্লেদাক্ত স্বরূপটি উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে এমন একটি বাড়ীতে অনঙ্গরঙ্গিনীর মতো শিক্ষিতা ও রুচিশীলা নারীর সঙ্গে তার আদর্শ সংসার রচনাই ছিল স্বাভাবিক। এই বাড়ী এবং সেই নারী আজ ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে 'মর্কট'-রূপী গোকুলচন্দ্রের দখলে। এই বাড়ীর বারান্দায় বারান্দায় গোকুলচন্দ্রকে দণ্ডায়মান দেখে নিমচাঁদ কাম্যজীবনের সঙ্গে তার বর্তমান অবস্থার মেরুদূর বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি 'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের নায়ক-নায়িকার মিলনের মধ্যে দুই বৈরী পরিবারের অলঙ্ঘনীয় ব্যবধানের ভাব-বিপর্যয়ের ব্যঞ্জনায় নিমচাঁদ নিজেকে বিজনবাসী মনে করে—"It is the East, Juliet is the Sun"[১২৪] এ-ভাবে বিত্তকৌলীন্যের উত্তপ্ত সূর্যের রুদ্ররোষে মেধা, মনন ও মানসিকতায় শক্তিমান, পরিস্রুত এবং সৎ উনিশ শতকী রোমিও-রূপী নিমচাঁদের

পতন হলো। অথচ বিত্ত-সামর্থ্যের জন্যে গোকুলচন্দ্র এবং অটলচন্দ্র দু'জন বিপরীতমুখী জীবনাদর্শের প্রবক্তা একত্রিত হলো। এ যেন 'বাবা জগন্নাথ'কে কালীঘাটের সঙ্গে 'Amalgamate' করা। সামাজিক ব্যভিচার ও দুর্নীতির কাছে পরাজিত, ভূলুন্ঠিত হয়েও অপমানিত নিমচাঁদ এতদ্‌সত্ত্বেও স্বর্গীয় আলোকে আহ্বান করেছে মুক্তির জন্যে, "Hail ! holy light ! offspring of Hevenly first born. Or the Eternal coeternal beam, May I express the unblamed ?"[১২৫] জীবনের এই পবিত্র আলোকের সন্ধান আর কোনদিন নিমচাঁদ লাভ করতে পারবে না জেনে নিজেকে শেষ পর্যন্ত 'হিমাদ্রি অঙ্গজ মৈনাক'[১২৬] রূপে উপমিত করেছে। পাখার জ্বালায় মৈনাক যেমন জলে আত্মগোপন করে, তেমনি হৃদয়, মন ও মস্তিষ্ককোষের চিকিৎসাতীত যন্ত্রণায় নিমচাঁদ আজ জীবন-পলাতক। নাটকের পরবর্তী অঙ্কের দৃশ্যাবলীতে আত্মদীর্ণ, পরাজিত এবং রক্তাক্ত নিমচাঁদের ঐ পরিণামই চিত্রিত হয়েছে।

এইভাবে কাহিনী অপেক্ষা পরিস্থিতি, ঘটনা অপেক্ষা চরিত্র এবং প্রত্যক্ষ সংঘাত অপেক্ষা ভাবদ্বন্দ্বে 'সধবার একাদশী'র নাটকীয় অগ্রগতি নির্মাণ করা হয়েছে। চরিত্রকেও অনেক সময় করা হয়েছে প্রতীকায়িত। এ-জন্যে খণ্ডচিত্র, খণ্ড খণ্ড চরিত্র এবং বস্তুগত উপমার ব্যবহারে নাটকের মৌলভাববস্তু হয়েছে ব্যঞ্জনাময়। নিমচাঁদের ব্যর্থতা থেকে অধঃপতন, মাতাল জীবনের সহচর রূপে বিত্তবান অটলকে নির্বাচন এবং বিদ্যা, রুচি ও সচেতনার কারণে মনোবিকার ও মানবিকতাবোধের পুর্নজাগরণের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিস্থিতি, চরিত্রচিত্র এবং ভাবদ্বন্দ্ব প্রকাশ করা হয়েছে। একটি 'ঘড়িকে'[১২৭] নির্বাচন করে তার প্রতীকে সময় ও সমাজের ভাবসত্তা এবং নিমচাঁদের ব্যর্থতাকে সামঞ্জস্যময় করে উপস্থাপন করার যে কৌশল দীনবন্ধু গ্রহণ করেন, তা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পারিবারিক সুস্থতা, নব্য প্রণয়-আকাঙ্ক্ষা, সামাজিক কৌলীন্য এবং নব্য শিক্ষার প্রতীক অনঙ্গরঙ্গিনীর কোমরের 'ঘড়ি'। সঙ্গত কারণেই এই প্রতীকায়িত জীবনের অধিকারী হওয়া উচিত নব্য-শিক্ষিত নিমচাঁদের। বিত্তকৌলীন্যের শক্তিতে এই 'ঘড়ি' গোকুলচন্দ্র ছিনিয়ে নিয়েছে। গোকুলের স্ত্রী অনঙ্গরঙ্গিনীকে অপহরণের দৃশ্যে সমাজ-প্রগতির লক্ষ্যচ্যুতির কারণে এই ঘড়ি বৃত্তবান অটলের

স্ত্রী কুমুদিনীর কোমরে উঠেছে। এই 'ঘড়ি'র চিহ্ন ধরে অটল কুমুদিনীকে বাইরে বের করে আনে। পারিবারিক এই বিপর্যয়ের জন্য নিমচাঁদ রামবাবুর হাতে বিনাদোষে হয়েছে প্রহৃত। সমাজ-সভ্যতার উল্লম্ফনধর্ম এবং তজ্জনিত বিপর্যয়ের কারণে যেমন কুমুদিনীর কোমরে উঠে অনঙ্গরঙ্গিনীর ঘড়ি, অটল শাশুড়ী-তুল্য অনঙ্গরঙ্গিনীকে অপহরণে উন্মত্ত হয়; তেমনি একই সামাজিক অংসগতির কারণে ঘরের বৌকে জনসমক্ষে বারবণিতার আসনে উপবেশন করতে হয়েছে। ঐ একই বিপর্যয়ের কারণে নির্দোষ নিমচাঁদকে উপর্যুক্ত ঘটনার জন্য অভিযুক্ত হতে হয়েছে। এই বিপর্যয় সম্পর্কে বিত্তবান সমাজের কপটাচারী মিথ্যাচারী অটল নিজের স্ত্রী কুমুদিনীকে অপহরণের জন্য নিমচাঁদকে রামধন রায়ের সামনে ঠেলে দেয়। আর রামধন বাবুও অটলকে ছেড়ে নিমচাঁদকে আক্রমণ করে। এই অন্তঃঅসঙ্গতি লক্ষ্য করে নিমচাঁদ সময় ও সমাজের অবক্ষয়িত 'Professor of Moral Philosopher'[১২৮] রামধন রায়কে ব্যঙ্গ করে বলে, "রামবাবু, আপনি অতিবিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিলকলাপ কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে, তারাই বলতে পারে, আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পিযূষ, And the last, through not the least, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রগুলিন যারপর নাই Edifying, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হয়েছে, Lock on Human Understanding পড়ে এরূপ হয়নি।"[১২৯] এই ব্যঙ্গাত্মক উক্তিতে যেমন নিমচাঁদের অন্তর্বেদনা প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বিত্তবান শ্রেণীর শিক্ষা, বুদ্ধি, ও আভিজাত্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা হয়েছে উন্মোচিত। একটি বিরাট জাতীয় বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমাজ-সভ্যতার প্রতিভূরা যখন বিভ্রান্ত, তখন এ-বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে নিমচাঁদ নির্দ্বন্দ্ব। সে রামধন বাবুকে বলে, 'সময়ে'র এই বিপর্যয়ের জন্য এককভাবে কেউ দায়ী নয়। 'সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ' হলেই সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বিত্তজাত সভ্যতা-গর্বের সঙ্গে বিদ্যা-উদ্‌ভূত রুচির মণিকাঞ্চন যোগ না হলেই বিত্ত ও বিদ্যা নিষ্ফল হয়ে যায়। অনঙ্গরঙ্গিনীর 'ঘড়ির' স্থান বিপর্যয়ে বিত্ত-কুলীন সমাজের আভ্যন্তর দুর্বলতা এবং বিত্তহীন নব্যশিক্ষিত নিমচাঁদের জীবনের নিষ্ফলতা চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গোকুলচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখে 'চিতপুরের' রাস্তায় দারোয়ান কর্তৃক নিমচাঁদের

পতন—তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গোকুলচন্দ্রের স্ত্রী 'ঘড়িরূপী' 'সময়ের' বিপর্যয়ে রমেধন কর্তৃক নিমচাঁদকে প্রহারে কাহিনীর ভাবগত ঐক্য হয়েছে সামঞ্জস্য-সন্ধানী কোন কাহিনী, বা প্রথাসিদ্ধ ঘটনাবৃত্ত কিংবা প্রত্যক্ষ ঘটনাগত সংঘাতে সৃষ্টি নয়, একটি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রকাশ করা হয়েছে সময়-চরিত্র ও ভাবদ্বন্দ্ব। দেশকালের বহুমাত্রিক এবং জটিলতর পরিবেশের বিচিত্র চেতনাস্রোতে বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্ন, খণ্ড-বিখণ্ড চরিত্রপুঞ্জ স্থাপন করে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অখণ্ড করা হয়েছে। এই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার মধ্যেই নিমচাঁদের মানস-বিবর্তন হয়েছে ব্যঞ্জনাময়তায় সমগ্রতা-সন্ধানী। প্রতীকায়িত দৃশ্য-যোজনা, ঘটনাংশের উল্লম্ফনরীতি নিমচাঁদের মানস-চেতনার ক্রমভঙ্গের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে 'সধবার একাদশী'র সংগঠন-প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছে উপর্যুক্ত ব্যঞ্জনাধর্ম। এই ব্যঞ্জনারীতি কেবলমাত্র বিষয়-উদ্ভূত নয়, বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যকে রূপান্বিত করার জন্য দীনবন্ধুর সচেতন শিক্ষাজ্ঞান-নির্মিতিও বটে। ঠিক এই কারণে দীনবন্ধু শেক্সপীয়রের ট্রাজেডির প্রথানুসারী সংগঠনরীতি এই নাটকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেননি। স্মরণীয়, শেক্সপীয়রের ট্রাজিডিকে সংগঠন-বিন্যাসের দিক থেকে মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। এই বিভাজনকে A. C. Bradley এ-ভাবে উপস্থাপন করেছেন : "The first of these sets forth or expounds the situation, or state of affairs, out of which the conflict arises ; and it may therefore, be called Exposition. The second deals with the definite beginning the growth and the vicissitudes of conflict. It form accordingly the bulk of the play, comprising the second. Third and forth Acts, and usually a part of the First and a part of fifth. The final section of the tragedy shows the issue in the conflict catastrophe."[১৩০]

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য নাটকের সন্ধিসমন্বিত 'Exposition. Rising action, Climax, Falling action and Denouement.'[১৩১]—এই পঞ্চাঙ্ক রীতি 'সধবার একাদশী'তে সচেতনভাবে বর্জন করা হয়েছে। শেক্সপীয়রের নাটকে পর্যায় ক্রমিক বিন্যাসরীতি সম্ভব হয়েছে এ-জন্য

যে, তাঁর নাটক নিষ্ক্রিয় চরিত্রের বক্তৃতা ও আবেগ-সর্বস্ব চিত্রপুঞ্জ নয়, ঘটনা-দুর্ঘটনা-সংযোজনা (events) এবং কর্মসংযোজনায় (actions) তাঁর নাটক পঞ্চসন্ধিতে বিন্যস্ত। যেমন, 'রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েট'। রোমিও মন্টেগু এবং জুয়িলেট ক্যাথুলেট---দুই পরিবারের পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংঘাতের পটভূমিকায় তাদের প্রবল প্রেমদৃশ্যের উন্মোচন ; দ্বিতীয় পর্যায়ে প্যারিস ও জুলিয়েটের বিবাহের সামাজিক আয়োজন তথা সংকটের গম্ভীরতা সৃষ্টি ; তৃতীয় পর্যায়ে বিরোধ--সংশয়াচ্ছন্ন-অশ্রুপাত ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রেমের ও জীবনের সমাপ্তি চিত্রিত হয়েছে। 'সধবার একাদশী'তে এ-জাতীয় সংজ্ঞানুসারী 'মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ-উপসংহৃতি'[১৩২] স্পষ্ট নয়। একটি সামাজিক ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে চরিত্রসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব নির্মিত হয়েছে। নিমচাঁদ বনাম অটল-কেনারাম-জীবনচন্দ্র, গোকুলচন্দ্র, রামধন রায় ; নিমচাঁদ বনাম অটল, নকুলেশ্বর-কাঞ্চন ; নিমচাঁদ বনাম অটল-কেনারাম, ভোলাচাঁদ-রামমাণিক্য প্রমুখের দ্বন্দ্বকে বিত্তকৌলীন্য ও বিদ্যা-অহংকারের দ্বন্দ্বে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিত্ত-উদ্ভূত চরিত্র এবং সেই চরিত্রের সংঘাতে এই দ্বন্দ্ব নির্মিত নয়। সমাজ-সত্যের এক বিনাশী স্থায়ীভাবের অস্তিত্ব থেকে আলোচ্য নাটকের চরিত্রসমূহের কর্মপ্রবৃত্তি, আচরণধর্ম এবং অন্তরাবেগ উৎসারিত হয়েছে, ঘটনাবৃত্তে নয়। যুগচিহ্নিত চরিত্রপুঞ্জের আবেগান্বিত চিত্রই যেন পরস্পর ভাবদ্বন্দ্বে স্থায়ীভাবকেই স্ফটিকায়িত করেছে। বিত্তবান সমাজ-শাসিত পরিবার-জীবন ও উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত ব্যক্তি-জীবন একটি ভাববৃত্তে কিভাবে মূর্খতায়, অশ্লীল সংস্কৃতি-চর্চায় এবং রক্তাক্ত আত্মসমীক্ষায় স্বীয় অন্তঃসারশূন্যতা এবং আত্মযন্ত্রণা প্রকাশ করেছে, তারই অভিনব শিল্পরূপ 'সধবার একাদশী'।

উপর্যুক্ত সামাজিক-ভাবদ্বন্দ্ব থেকে 'সধবার একাদশী'র কেন্দ্রীয় চরিত্র আত্মসাৎ করেছে তার চরিত্রগত উপাদান ও উপকরণ। এ-কারণে কেন্দ্রীয় চরিত্র নিমচাঁদ ব্যতিরেকে অন্য সব চরিত্র যুগচিহ্নিত। এ-সব চরিত্রের টাইপধর্মিতা তাই অনস্বীকার্য। উনিশ শতকের জটিলতর সমাজ-দেহে এদের অস্তিত্ব ছিল বাস্তব। সেই সমাজ-দেহ থেকে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় দীনবন্ধু এদেরকে আহরণ করে নিমচাঁদের চারদিকের দেয়ালে সেঁটে দিয়েছেন। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এখানে যে, এই চরিত্র-

চিত্র সেখানে জড় ছবি হয়ে থাকেনি, তারা নির্দিষ্ট পরিসরে পুনর্জাত হয়েছে। তাদের আচরণ ও উচ্চারণ এইভাবে নিমচাঁদের চরিত্রকে পূর্ণতা দান করেছে। উনিশ শতকের সামাজিক বৃত্তে নিমচাঁদ কোন অসাধারণ ব্যক্তি নয়। ট্রাজেডির নায়ক যেমন হয় 'a person of high degree or public importance, and that his actions and sufferings are an unusual kind'[১৩৩]—তা সে নয়। কিন্তু যুগের ব্যর্থতার ট্রাজেডি তার মধ্যে আরোপ করায় আত্মবিশ্লেষণ, আত্মখনন এবং আত্ম-উন্মোচনে এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সাধারণ মানুষটি 'exceptional being' হয়ে উঠেছে। তার অন্তর্দ্বন্দ্বে উনিশ শতকের বাংলার 'নব-জাগরণ'-উদ্ভূত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির নবজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবতাবোধ, আত্মমর্যাদাজ্ঞান এবং বিত্ত ও বৈরী প্রশাসন-উদ্ভূত পরাজয়-চেতনা এবং আত্মযন্ত্রণা উন্মোচিত হয়েছে। 'সধবার একাদশী'র যুগচিহ্নিত চরিত্রাবলী নিমচাঁদকে ঘিরেই উদ্ভূত, প্রকাশিত এবং পরিণতি লাভ করেছে। নিমচাঁদকে বাদ দিয়ে ঐ সব চরিত্র নিশ্চল চিত্রসমষ্টি মাত্র, নিমচাঁদের চরিত্রে শক্তি সঞ্চার করেই এরা জীবন্ত, চলমান। এ-কারণে এরাও 'সধবার একাদশী'র ভাববৃত্তে অনিবার্য এবং অব্যর্থভাবে ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে। ইতঃপূর্বে কেন্দ্রীয় চরিত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়েছে বলে স্বতন্ত্র মূল্যায়ন তাই অপ্রয়োজনীয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, বাংলা নাটকের অঙ্গ-বিন্যাসে ও রস-পরিণাম নির্মাণে ইম্প্রেশন-ধর্ম আবিষ্কার দীনবন্ধু মিত্রের অনন্য কীর্তি। এর আগে বাংলা নাটকে এ-জাতীয় সুদূর-সঞ্চারী নবরীতির চর্চা বড় বেশী দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের ঘটনাবৃত্ত-উদ্ভূত পঞ্চাঙ্ক রীতির প্রথম সার্থক রূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু ক্রিস্টোফার মার্লোর প্রতীকাশ্রয়ী, চেতনাতল-উদ্ভাসী, অস্তিত্ব-সন্ধানী এবং আবেগী নাটক 'ডক্টর ফস্টাস' দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র রূপ ও রীতির নবতর নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও শক্তিসঞ্চার করেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রভাব যতটুকুই থাক, দীনবন্ধুর মিত্রের প্রতিভান শক্তি, ব্যাপক সমাজ অভিজ্ঞতা এবং গভীর ইতিহাসবোধ যে 'সধবার একা-দশী'র বিষয়বস্তু ও বিন্যাসগত রূপাবয়ব নির্মাণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে তা অনস্বীকার্য। 'নীলদর্পণ' নাটকের বিষয়-স্বাতন্ত্র্য

এবং 'নবীন তপস্বিনী'র সংগঠন-সতর্কতাও এই নবজাত শিল্পানুধ্যানে সাহায্য করেছে। এ-কারণে 'সধবার একাদশী'র মাধ্যমে দীনবন্ধু গুণ-গত বিবর্তনে বাংলা নাটকের ইতিহাসে যুগস্রষ্টার মর্যাদা অর্জন করেছেন; 'সধবার একাদশী'ও অর্জন করেছে কালোত্তীর্ণ ও চিরায়ত সাহিত্যের মহিমা। আর উপনিবেশ-শাসিত উনিশ শতকের ত্রিশঙ্কুরূপী সমাজের আত্মবিচ্ছিন্ন ও সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের অনিরুদ্ধ যন্ত্রণার প্রতীক হয়ে উঠেছে নিমচাঁদ।[১৩৪]

তথ্য-নির্দেশ

১ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র ভূমিকা।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র ভূমিকা (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৫৭), কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩ ক্ষেত্র গুপ্ত ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে নভেম্বরের কিছুদিন আগে 'সধবার একাদশী' প্রকাশিত হয়েছে বলে অনুমান করেছেন— দ্র. দীনবন্ধু রচনাবলী, পূর্বোক্ত, ভূমিকা।

৪ বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সংসদ, কলিকাতা পৃ. ৮২৮

৫ অজিতকুমার ঘোষ ও আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র ভূমিকা।

৬ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০-২৭১

৭ 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র ভূমিকা। পূর্বোক্ত।

৮ বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৫

৯ 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র ভূমিকা। পূর্বোক্ত।

১০ 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র ভূমিকা। পূর্বোক্ত।

১১ দ্রষ্টব্য, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

১২ দ্রষ্টব্য, সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পূর্বোক্ত পৃ. ৯১। অজিতকুমার ঘোষ ও আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত দীনবন্দু রচনাবলীর ভূমিকা।

১৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'দীনবন্দু-গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত 'সধবার একাদশী' (দ্বিতীয় সং ১৩৫৩), ভূমিকা। কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৪ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র পাওয়া গেলে হয়তো এ বিতর্কের অবসান হতো। সেখানে স্বয়ং নাট্যকার এটিকে কি অভিধায় ভূষিত করেছেন, তা-যতদিন জানা সম্ভব হচ্ছে না ততদিন নাটকটির আভ্যন্তর বৈশিষ্ট্য দ্বারাই এ-প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।

১৫ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত এবং ১২৭৯ সালে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল 'নাটক ও নাটকের অভিনয়'। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা-সাহিত্য', ২য় সং ১৩৬২, কলিকাতা, এ মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, গ্রন্থে প্রবন্ধটি 'সধবার একাদশী' শিরোনামায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

১৬ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

১৭ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

১৮ Aristotle : Classical literary criticism, P. 48

১৯ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

২০ বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

২১ ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

২২ বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৮

২৩ বঙ্গদর্শন ১২৮৩, বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত।

২৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন যে, দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী'কে "নাটক বলে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন"। তবে এই তথ্যের কোন উৎস উল্লেখ করা হয়নি। দ্রষ্টব্য, দীনবন্ধু রচনা-সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

২৫ কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিত ও 'বান্ধব' (১২৮৩) পত্রিকায় প্রকাশিত 'নাটক শীর্ষক প্রবন্ধটি শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত পূর্বোক্ত 'সমালোচনা-সাহিত্য' গ্রন্থে সন্নিবেশিত।

২৬ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০

২৭ ঐ, পৃ. ১৮২

২৮ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

২৯ বাঙ্গালা, সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৩০ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত দীনবন্ধু রচনাবলীর ভূমিকা।

৩১ ঐ

৩২ শ্রী সুশীলকুমার দে ১৩৫৮, 'দীনবন্ধু মিত্র', তৃতীয় সং ১৩৭৯, কলিকাতা, এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লিমিটেড। পৃ. ৭০-৭১

৩৩ Ramesh Chandra Dutta, Ibid, P. 189

৩৪ P. Guha Thakurta Ibid. P. 112-114

৩৫ অজিতকুমার ঘোষ ও আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র ভূমিকা।

৩৬ নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪-২৩৫

৩৭ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ১৩৮৮, দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একদশী, কলিকাতা, এডুকেশন্যাল পাবলিশিং হাউস, পৃ. ২৮-৩৫

৩৮ ঐ, পৃ. ৪০

৩৯ দ্রষ্টব্য, এডওয়ার্ড রেজিনস্কি, গেরাসিম লেবেদেফ, সৈয়দ আকরম হোসেন অনূদিত, 'সাহিত্য পত্রিকা', এয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৬ ঃ শীত, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃ. ১৯৬-১৯৭

৪০ দ্রষ্টব্য, নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

৪১ 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', ললিতচন্দ্র মিত্র লিখিত, উদ্ধৃত, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু-রচনাবলী'র ভূমিকা।

৪২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'সধবার একাদশী'র ভূমিকা। পূর্বোক্ত

৪৩ সুশীলকুমার দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

৪৪ দ্রষ্টব্য, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-৩১

৪৫ "এই অভিজাত এলিট শ্রেণীর বংশধরেরাই স্কলার ও টিচার হয়েছেন, সিভিল সার্ভেন্ট, সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, স্কুল ইনস্পেক্টর, গ্রন্থকার ও সাংবাদিক হয়েছেন, এবং তাঁরাই ক্রমবর্ধমান বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর 'লীডার' ও 'গাইড' হয়েছেন",—বাংলার বিদ্বৎসমাজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

৪৬ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩০২, বিদ্যাসাগর, সপ্তম সংস্করণ ১৯৫৭, কলিকাতা, এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং। পৃ. ৭১-১৪৩

৪৭ দ্রষ্টব্য, বাংলার নবজাগৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২-১৫৮

৪৮ মাইকেল মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা', 'কৃষ্ণকুমারী' এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী'র কেন্দ্রীয় চরিত্রসমূহ অভিজাত ও উচ্চবিত্তের মানুষ। সেই অর্থে নিমচাঁদ সাধারণ মানুষ। তাকে অকারণ আদর্শের নির্মোকে আবৃত করা হয়নি, দোষে-গুণে তাকে রক্তমাংসের মানুষ করা হয়েছে।

৪৯ দ্রষ্টব্য, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪

৫০ দ্রষ্টব্য, রামগতি ন্যায়রত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

৫১ দ্রষ্টব্য, বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত পৃ. ৮৩২

৫২ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৫৩ পূর্বোক্ত

৫৪ W. H. Carey : The good old days of Honourable John Company, Vol.I. P. 450

৫৫ দ্রষ্টব্য, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

৫৬ দ্রষ্টব্য, অজিতকুমার ঘোষ ও আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র ভূমিকা।

৫৭ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু রচনাবলী'র ভূমিকা।

৫৮ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৫৯ ঐ

৬০ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬১ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৬২ সধবার একাদশী, প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৬৩ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬৪ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬৫ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা।

৬৬ সধবার একাদশী, প্রথম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬৭ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬৮ ঐ

৬৯ ঐ

৭০ সধবার একাদশী, প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৭১ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭২ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৩ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৪ ঐ

৭৫ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৭৬ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৭৭ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৭৮ ঐ

৭৯ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮০ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮১ ঐ

৮২ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৩ ঐ

৮৪ সধবার একাদশী; তৃতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৫ ঐ

৮৬ ঐ

৮৭ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৮ ঐ

৮৯ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫-১৫৭

৯০ ঐ

৯১ ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী'র বসুমতী সংস্করণের ভূমিকা।

৯২ ঐ

৯৩ ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪

৯৪ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

৯৫ বঙ্কিম-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৮

৯৬ P. Guha Thakurta, Ibid, pp. 113-115

৯৭ Ibid, p. 113

৯৮ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

৯৯ ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা।

১০০ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'সধবার একাদশী'র ভূমিকা, পূর্বোক্ত।

১০১ ঐ

১০২ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু-রচনাবলী'র ভূমিকা।

১০৩ ঐ

১০৪ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ১৩৮৮, 'দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী', কলিকাতা : এডুকেশন্যাল পাবলিশিং হাউস।

১০৫ নির্মলেন্দু ভৌমিকের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থটির অনেক বক্তব্য-বিষয়কে 'সুদূর কল্পিত' এবং 'অনিবার্য সম্পর্কবহির্ভূত' বলে যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ।

১০৬ শেকসপীয়রের নাটকে এ-জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবোধের রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করা যায়। ম্যাকবেথ এ-কারণে জীবন-সম্পর্কে উচ্চারণ করে, 'lifes but a walking shadow !' শেক্সপীয়রের নাটকের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক Stanford M. Lyman এবং Marvin B. Scott 'The Drama of Social Reality', [1975, Newyork : Oxford University] গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

১০৭ দ্রষ্টব্য, নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭-২২৮

১০৮ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'দীনবন্ধু-রচনাবলী'র ভূমিকা।

১০৯ শ্রীবৈদ্যনাথ শীল, ১৩৬৪, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, কলিকাতা : মহাজাতি প্রকাশক, পৃ. ১৪৭-৪৮

১১০ নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৯

১১১ সধবার একাদশী, প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১১২ ঐ

১১৩ ঐ

১১৪ ঐ

১১৫ ঐ

১১৬ ঐ

১১৭ ঐ

১১৮ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১১৯ ঐ

১২০ দ্রষ্টব্য, এ. কে. এম. খায়রুল আলম, 'দীনবন্ধু মিত্রের সাহিত্য-কর্ম', অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৮-৭৯

১২১ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১২২ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১২৩ ঐ

১২৪ উদ্ধৃত, সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১২৫ সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১২৬ ঐ

১২৭ সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১২৮ ঐ

১২৯ ঐ

১৩০ A. C. Bradley, 1904, Shakespearean Tragedy, Reprinted Macmillan student's edition, 1979, Hongkong: Macmillan Press Ltd. P. 30

১৩১ দ্রষ্টব্য : নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা, পূর্বোক্ত পৃ. ১৮১-১৮২

১৩২ নাট্যতত্ত্ব-মীমাংসা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

১৩৩ A. C. Bradley, Ibid, P. 13

১৩৪ উনবিংশ শতাব্দীর কর্নওয়ালিস-সৃষ্ট বঙ্গীয় বিত্তবান সমাজে অবহেলিত বিদ্বান নিমচাঁদ যেন বিংশ শতাব্দীর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিতে'র অপু। মেধা, মন, মনন ও কর্মোদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও সে যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে কলকাতায় আত্মবিচ্ছিন্ন, প্রতারিত এবং যন্ত্রণা-পীড়িত। বিত্তের শহরে বিত্তহীন-জীবনের গ্লানি ব্যক্ত করার জন্য গভীর রাতে জনশূন্য কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে 'নিমচাঁদের অনুকরণে ইংরাজি' কবিতা আবৃত্তি করে সেও 'স্বর্গীয় আলোকে'র জন্য উচ্চকণ্ঠ হয়। —দ্রষ্টব্য : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরাজিত, দশম পরিচ্ছেদ।